কাকাবাবু সমগ্র

কাকাবাবুর প্রথম অভিযান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. সন্তুর ঘরখানা তার নিজস্ব পৃথিবী 2
২. গরমকালে সাঁতার 13
৩. পরদিন সকালে অনেকখানি জানা গেল 25
৪. পুলিশের বুটের আওয়াজ 38
৫. বারান্দায় বসে শুরু হল গল্প 51
৬. সকালবেলা চা খেতে-খেতে 64
৭. বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে 77
৮. খাজুরাহো মন্দির দেখতে যাওয়ার পথে 93
৯. আবার বসা হল বৈঠকখানায় 105
১০. ছিপ দিয়ে মাছধরার খুব শখ 122

১. সন্তুর ঘরখানা তার নিজস্ব পৃথিবী

সন্তুর ঘরখানা তার নিজস্ব পৃথিবী। তিনতলার ছাদে ওই একখানাই ঘর, ছাদে বিশেষ কেউ আসে না। ঘরের মধ্যে সন্তু লম্ফঝম্ফ করে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে, কিংবা একলা-একলা তলোয়ার খেলে, কেউ দেখবার নেই। সন্তু যখন আরও ছোট ছিল, কালি দিয়ে মুখে গোঁফ-দাড়ি এঁকে কিংবা নিজেই একটা মুখোশ বানিয়ে কখনও ফ্যান্টম বা ম্যানড্রেক সাজত, কখনও সুপারম্যান, আবার কখনও তীর-ধনুক হাতে অর্জুন। খাটের মাথার দিকটায় উঠে সে ঘোড়া চালাত খুব জোরে, আর মাঝে-মাঝে চেঁচিয়ে উঠত, হে নীল ঘোড়াকা সওয়ার। হো নীল ঘোড়াকা সওয়ার?

সন্তু নিজের একটা নাম দিয়েছিল, সেটা খুব গোপন, আর কেউ জানে না। ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো। সে বাঙালি নয়, এ-পৃথিবীরই কেউ নয়, দূর মহাকাশ থেকে মাঝে-মাঝে পৃথিবীতে বেড়াতে আসে। ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর মুখের ভাষাও তৈরি করেছিল সন্তু। বিলিবিলি খাণ্ডা গুলু? বুমচাক, বুমচাক ডবাংডুলু! উসুখুসু সাকিনা খিনা? কামুলু টামুলু জামুলু। ফিংকা চিংমিনিমিনি মাজুনু জানুনু লাকুনু। পিঠে একটা সাদা চাদর বেঁধে ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো আকাশে উড়ে বেড়ায়, চন্দ্র-সূর্য, এমনকী মেঘের সঙ্গেও সে কথা বলে। ওই ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর ভাষা সন্তু একটা খাতাতেও লিখে রেখেছিল, তখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। এখন সেই লেখাটা দেখলে তার হাসি পায়।

এখন আর সন্তু ওরকম কিছু সেজে খেলা করে না বটে, কিন্তু একলা ঘরের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কবিতা আবৃত্তি করে। ক্লাস নাইনে পড়ার সময়েই সে মেঘনাদবধ কাব্য পুরো মুখস্থ করে ফেলেছিল, অনেক শব্দেরই মানে বুঝত না, তাতে কিছু আসে যায় না। এখন তার একটা নতুন শখ হয়েছে, সে নাচ শিখছে। কারও কাছে শিখতে যায় না, ঘরের দরজা বন্ধ করে ক্যাসেট প্লেয়ারে রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা ইংরিজি গান চালিয়ে সে নিজে নিজে নাচে। তার এই নাচের কথা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা বড় বোর্ড। তাতে সন্তু তার প্রিয় সব খেলোয়াড়, গায়ক, লেখকদের ছবি পিন দিয়ে আটকে রাখে। ছবিগুলো মাঝে-মাঝেই বদলে যায়। একটা সাদা কাগজে প্রতি সপ্তাহে সে এক-একটা বাণী লিখে রাখে। বাণীটা তার নিজের জন্য, নিজেরই বানানো। গত সপ্তাহে লেখা ছিল, কফি গরম, আইসক্রিম ঠাণ্ডা, দুটোই একসঙ্গে খাওয়া যায়। খুব রাগ হলেও হো-হো করে হাসি প্র্যাকটিস করো। এ সপ্তাহে তার বদলে লেখা আছে, খিদে পেলে গান গাও, প্রাণ খুলে গান গাও, খুব যদি গান পায়, খুব কষে ঝাল খাও, ঝাল চানাচুর খাও।

সন্তুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র জোজো এই তিনতলার ঘরে আসে। পরশুই এসেছিল। সে সন্তুর ওই বাণীর তলায় লিখে রেখেছে, খুব যদি ঝাল লাগে, নদীতে সাঁতার দাও!

সন্তু অনেক রাত জেগে বই পড়ে। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, সমস্ত পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তখন বই পড়তে বেশি ভাল লাগে। পড়ার বই, গল্পের বই। ভূতের গল্প পড়তে একটু গা-ছমছম করে বটে, কিন্তু সন্তু জোজোর মতন ভূতে বিশ্বাস করে না। জোজো কক্ষনও একলা ঘরে শুতে পারে না। জোজোদের বাড়ির ঠিক পেছনেই খানিকটা ফাঁকা জমি আর একটা ভাঙা বাড়ি আছে। জোজোর ধারণা, তিনটে ভূত থাকে ওই বাড়িতে। কোনওদিন নিজের চোখে দেখেনি, তবু কী করে জানল যে, ঠিক তিনটে ভূত, তা কে জানে। জোজোর বাবা অবশ্য এমন জোরালো মন্ত্র পড়ে দিয়েছেন যে, ভূতে কোনওদিন জোজোর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

বই পড়তে-পড়তে রাত দুটো-আড়াইটে বেজে গেলেও কিন্তু বেশি বেলা করে ঘুমোবার উপায় নেই সন্তুর। ছাদে অনেক ফুলের টব আছে। প্রত্যেক দিন ঠিক পৌনে ছটায় মা সেই ফুলগাছগুলোতে জল দিতে আসেন। আগে ডেকে তোলেন সন্তুকে। ঘরের দরজা ভেজানো থাকে, মা ঘরের মধ্যে এসে চারদিকে ছড়িয়ে থাকা বই, গেঞ্জি, রুমাল, কলম সব গুছিয়ে রাখেন। তারপর সন্তুর শিয়রের কাছে এসে তার গালটা বেশ জোরে টিপে

ধরে বলেন, ঘুমপরী এবার বাড়ি যাও, আমার খোকাটি এবার ছোলা গুড় খাবে। অ্যাই সন্তু, ওঠ।

সত্যি-সত্যি সন্তুকে রোজ সকালে ভেজানো ছোলা আর আখের গুড় খেতে হয়। তার ভাল লাগে না অবশ্য। তবু এটাই তাদের বাড়ির নিয়ম। সবাই খায়। কাকাবাবু মাঝে-মাঝে আপত্তি করে বলেন, বউদি, এসব তো উঠতি বয়েসের ছেলেমেয়েদের পক্ষে ভাল, আমাকে জোর করে খাওয়াচ্ছ কেন? মা শুনবেন না, খেতেই হবে।

তার আগে, চোখ-মুখ না ধুয়েই সন্তু মাকে গাছে জল দেওয়ায় সাহায্য করে। ট্যাঙ্ক থেকে জল এনে দেয়, কোনও-কোনও গাছের গোড়ার মাটি খুঁচিয়ে দিতে হয়। এক-একদিন সে মাকে বলে, মা, তুমি রোজ-রোজ কষ্ট করে ওপরে আসো কেন? আমিই তো সব গাছে জল দিয়ে দিতে পারি!

মা হেসে বলেন, আমি না এলে তোর আরও অনেকক্ষণ নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার খুব সুবিধে হয়, তাই না?

তারপর একটা গাছে আদর করে হাত বুলোতে বুলোতে আবার বলেন, সারা দিনে তো একবারই ছাদে আসি। যে গাছগুলো লাগিয়েছি, তা একবারও দেখব না? ফুল তো দেখবার জন্যই। জানিস সন্তু, গাছকে আদর করলে গাছ ঠিক বোঝে। তাতে তাড়াতাড়ি ফুল ফোটে।

তিনতলায় বাথরুম নেই, সকালবেলা সন্তু মায়ের সঙ্গেই নীচে নেমে যায়।

ছুটির দিনগুলোতে প্রায় সারাদিনই সন্তু নিজের ঘরে কাটায়। রান্নাঘর, খাবার জায়গা একতলায়, খিদে-তেষ্টা পেলে সেখানে যেতে হয় সন্তুকে। ছেলেবেলা থেকে তাকে শেখানো হয়েছে, বাড়ির কাজের লোককে এক গেলাস জলও এনে দিতে বলা চলবে না। নিজেরটা নিজেকে করে নিতে হবে। দরকার হলে সন্তু ডিম সেদ্ধ করতে পারে, কফি বানাতে পারে।

দোতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরটা কাকাবাবুর। ভেতরের দিকে দিদির ঘরটা এখন খালি পড়ে থাকে, অন্যটা মা বাবার। বাবা অবশ্য বেশিরভাগ সময়ই নীচের বৈঠকখানা ঘরে কাটান। তার পাশে একটা লাইব্রেরি ঘরও আছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে বাবার স্বভাবের কত তফাত। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও পাহাড়ে-জঙ্গলে কত অ্যাডভেঞ্চারে যান, আর বাবা বাড়ি থেকে বেরোতেই চান না। একবার দার্জিলিং গিয়েছিলেন, হোটেল বুক করা ছিল সাতদিনের, দুদিন থেকেই শীতের ভয়ে পালিয়ে এলেন। মায়ের তাড়নায় বাবাকে বাধ্য হয়ে কয়েকবার বেড়াতে যেতে হয়েছে বটে, প্রত্যেকবার ফিরে এসে বলেছেন, উঃ কী ঝকমারি! কুলির মাথায় জিনিস চাপাও, ঠিক সময় ট্রেনে ওঠো, ঠিক-ঠিক স্টেশনে নামো, আবার কুলি, গাড়ি নিয়ে দরাদরি, হোটেলে গিয়ে দেখবে বাথরুমে জল নেই..। কী দরকার বাপু এতসব ঝামেলা করার। বই পড়লেই তো সব জানা যায়।

বাবা ভ্রমণকাহিনী পড়তে খুব ভালবাসেন। বিছানায় শুয়ে সেইসব বই পড়তে-পড়তে তিনি মনে-মনে সাহারা মরুভূমি, আফ্রিকার জঙ্গল, হিমালয় পাহাড় কিংবা আলাস্কা ঘুরে আসেন। কাকাবাবু ভ্রমণকাহিনী পড়েন না, তিনি সময় পেলেই সামনে মেলে ধরেন নানা দেশের ম্যাপ। হিসেব করেন, কোথায়-কোথায় তাঁর এখনও যাওয়া হয়নি। এ-পৃথিবীর প্রায় অনেকখানিই তাঁর দেখা।

আজ একটা ছুটির দিন। সকালবেলা জলখাবারের টেবিলে কাকাবাবুর সঙ্গে সন্তুর দেখা হয়েছিল। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু দুপুরের খাওয়াটা বাদ দেন, আজ শুধু একবাটি সুপ খেয়েছেন নিজের ঘরে বসে। সকালবেলা সন্তু দেখেছিল, কাকাবাবুর গালে খরখরে দাড়ি। তাতে সে বেশ অবাক হয়েছিল। প্রতিদিন কাকাবাবু মর্নিংওয়াকে যান, তারপর আর বাড়ি থেকে না বেরোলেও তিনি দাড়ি কামিয়ে রোজ ফিটফাট থাকেন।

সন্তুর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝতে পেরে কাকাবাবু নিজের গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলেছিলেন, দাড়ি কামাবার সাবান ফুরিয়ে গেছে–

বাবা বললেন, তুই আমারটা নিলেই পারিস।

কাকাবাবু বললেন, না, তোমার ওই সাবানে আমার চলবে না। আমার ফোম সাবান ব্যবহার করা অভ্যেস হয়ে গেছে। সন্তু, তুই যখন বাড়ি থেকে বেরোবি, আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে যাস, একটা ওই সাবান কিনে আনিস।

সারাদিন সন্তু পড়াশুনো করেছে, খানিকটা নেচেছে, খানিকটা ঘুমিয়েছে, ঘর থেকে আর বেরোয়নি। কাকাবাবুর কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। বিকেলবেলা তার ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলতে যাওয়ার কথা, সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে পড়ে গেল। সারাদিন কাকাবাবুর দাড়ি কামানো হয়নি!

কাকাবাবুর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সন্তু বলল, কাকাবাবু, তোমার ফোম সাবান কিনে আনব, টাকাটা দাও।

কাকাবাবুর লেখাপড়ার টেবিলটা জানলার পাশে। রিভলভিং চেয়ারে বসে কাকাবাবু জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছেন। মুখটা ফেরালেন। কাকাবাবুর মুখের মধ্যে ওটা কী?

সন্তু ভাল করে দেখল, কাকাবাবুর মুখে একটা থার্মোমিটার।

এই অবস্থায় কোনও কথা বলা যায় না। কাকাবাবু নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে এগিয়ে দিলেন সন্তুর দিকে।

টাকাটা নিয়েও সন্তু নড়ল না।

কাকাবাবুর টেবিলের ওপর বেশ বড় একটা গ্লোব। একদিকের দেওয়ালজোড়া এভারেস্ট-এর চূড়ার ছবি। আর একদিকের দেওয়ালে অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপ। এই ম্যাপ কাকাবাবু প্রায়ই

বদলান। কাকাবাবু কি এবার অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন? সন্তুর বেশ আনন্দ হল। তা হলে এবার অস্ট্রেলিয়া দেখা হয়ে যাবে।

মুখ থেকে থার্মোমিটারটা বার করে নিয়ে কাকাবাবু দেখতে লাগলেন।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কত?

কাকাবাবু বললেন, কিছু না। দেখছিলাম এই ঘরের টেম্পারেচারের সঙ্গে আমার শরীরের টেম্পারেচারের কোনও তফাত হয় কি না!

কথাটা সন্তুর বিশ্বাস হল না।

কাকাবাবুর চোখ দুটো লালচে দেখাচ্ছে। চুল উসকোখুসকো। দেখলেই মনে হয়, বেশ জ্বর হয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, সদারি করে দাদাবউদিকে কিছু বলতে হবে না। আমার কিচ্ছু হয়নি। তুই খেলতে যা।

সন্তু কাকাবাবুকে কখনও অসুখে ভুগতে দেখেনি। কাকাবাবুর শুধু একটা পা জখম, কিন্তু স্বাস্থ্য দারুণ ভাল। একবার শুধু তাঁর শত্রুরা তাঁকে গুলি করেছিল, সেটাও আবার বাঘকে ঘুম পাড়াবার গুলি। সেবার কাকাবাবু বেশ কিছুদিন অসুস্থ ছিলেন। তখনও অনেকে বলেছিল, ওই গুলিতে মানুষের বাঁচা প্রায় অসম্ভব, কাকাবাবু সেরে উঠেছিলেন বেশ তাড়াতাড়ি।

নীচে নেমেই সন্তু মাকে বলল, মা, কাকাবাবুর খুব জ্বর হয়েছে। তোমাদের বলতে বারণ করলেন।

বাবাও খুব অবাক। জলের মাছের সর্দি হওয়ার মতনই যেন কাকাবাবুর জ্বর হওয়াটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

মা আর বাবা দুজনেই ওপরে উঠে এলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মা কাকাবাবুর কপালে হাত দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, বেশ জ্বর। একশো তিন-চার হবে বোধ হয়।

বাবা বললেন, কবে থেকে জ্বর হচ্ছে? রাজা, তুই আমাদের কাছে কিছু বলিস না কেন? ডাক্তার দেখাতে হবে না?

সন্তু লুকিয়ে রইল দরজার আড়ালে। কাকাবাবু বললেন, তোমরা আবার ব্যস্ত হলে কেন, এমন কিছু হয়নি।

মা বললেন, ইস, কিছু হয়নি? জ্বরে একেবারে গা পুড়ে যাচ্ছে। তুমি শুয়ে পড়ো, তোমার মাথা ধুইয়ে দেব।

বাবা বললেন, তা হলে তো ডাক্তারকে খবর দিতে হয়। চতুর্দিকে ম্যালেরিয়া হচ্ছে।

কাকাবাবু আর্তস্বরে বলে উঠলেন, না না, ডাক্তার ডাকতে হবে না। জ্বর হয়েছে, এমনই সেরে যাবে। ডাক্তার এলেই একগাদা ওষুধ দেবে, পটপট ইঞ্জেকশান ফুঁড়ে দেবে!

সন্তু মুচকি হাসল। কাকাবাবু রিভলভারের সামনে বুক পেতে দিতে ভয় পান না, কিন্তু ইঞ্জেকশান নিতে বড় ভয়। আফ্রিকা যাওয়ার সময় ইয়োলা ফিভারের ইঞ্জেকশান নিতে হয়েছিল, তখন তিনি আড়ষ্ট মুখে চোখ বুজে ছিলেন।

টেলিফোনটা তুলতে-তুলতে বাবা বললেন, রাজা, তুই কি মনে করিস, তুই ভীম না হারকিউলিস? সব মানুষেরই মাঝে-মাঝে অসুখ-বিসুখ করে, ডাক্তার দেখাতেও হয়। না হলে ডাক্তারদেরই বা চলবে কী করে?

কাকাবাবু গজগজ করতে-করতে বললেন, এবার আমার অসুখের কথা চারদিকে ছড়াবে, আর দলে দলে আত্মীয় বন্ধুরা দেখতে আসবে। বাঙালিদের এই এক স্বভাব, অসুস্থ

লোকের ঘরে ভিড় করে বসে থাকবে আর চেনাশুনো মানুষরা কে কোন অসুখে মরে গেছে, সেই গল্প করবে। আর চা-মিষ্টি খাবে!

ডাক্তার রথীন বসু কাকাবাবুরই বন্ধু। তিনি ঘরে ঢুকতে-ঢুকতেই বললেন, বা বা বা, রাজার অসুখ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি। এমনকী ডাক্তারদেরও কখনও সখনও অসুখ হয়, আর রাজা রায়চৌধুরীর কোনওদিন অসুখ হবে না, এতে আমাদের হিংসে হয় না? আমরা বিছানায় পড়ে থাকি আর ও জঙ্গলে-পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়ায়। এবার রাজা, তোকে অন্তত সাতদিন শুইয়ে রাখব, আর রোজ দুবেলা ইঞ্জেকশান!

কাকাবাবু বললেন, ইঞ্জেকশান না দিলে রোগ সারে না? তুই কি ঘোড়ার। ডাক্তার? ইঞ্জেকশান দেওয়ার চেষ্টা করে দেখ না, ঘুসিতে তোর নাক ফাটিয়ে দেব।

দুজন বয়স্ক লোক বাচ্চাদের মতন খুনসুটি করতে লাগলেন।

কাকাবাবুকে সত্যিই কয়েকদিন শুয়ে থাকতে হল। শরীর বেশ দুর্বল। রক্ত পরীক্ষায় জানা গেছে, ম্যালেরিয়া নয়, তাঁর নিউমোনিয়া হয়েছে।

বাবা বললেন, অনেকদিন এ-রোগটার নামই শুনিনি। তুই এ-রোগ কী করে বাধালি রাজা?

কাকাবাবু অবজ্ঞার সঙ্গে বললেন, কিছু না, বুকে একটু ঠাণ্ডা বসে গেছে, তাই রথীন বলে দিল নিউমোনিয়া। ওরা বড়বড় নাম দিতে ভালবাসে। ওষুধগুলোর নাম দেখো না, কীরকম শক্ত-শক্ত।

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েছিলেন পড়াশুনো করতে। ফেরার পথে দারুণ বৃষ্টি নেমেছিল। কাকাবাবু বৃষ্টি গ্রাহ্য করেন না, ট্যাক্সি পাননি, ইচ্ছে করেই বাসে না উঠে ময়দান দিয়ে হেঁটে এসেছেন চৌরঙ্গি পর্যন্ত। তারপর সেই ভিজে জামা পরেই গ্র্যান্ড হোটেলে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে দেখা করতে। বুকে ঠাণ্ডা বসে যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী!

অনেক ওষুধ খেতে হচ্ছে। কাকাবাবুর ধারণা, ওষুধগুলোর জন্যই তাঁর শরীর বেশি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

অসুখের কথা কী করে রটে যায় কে জানে! সত্যিই, দলে-দলে লোক কাকাবাবুকে দেখতে আসতে লাগল সকালে-বিকেলে। নরেন্দ্র ভার্মা খুব হতাশ। তিনি দিল্লি থেকে এসেছিলেন একটা রহস্য সন্ধানের ব্যাপারে কাকাবাবুকে নাগাল্যান্ডে নিয়ে যেতে। দেখতে এসে বললেন, রাজা রায়চৌধুরীর অসুখ, এ যেন আগুনের পেট গরম! তুমি নাগাল্যান্ডে যেতে চাও না, সেইজন্য অসুখের ভান করোনি তো?

কাকাবাবু বললেন, তুমি আমার বদলে সন্তুকে নিয়ে যাও!

ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনটা পড়ার পর নরেন্দ্র ভার্মা সস্নেহে সন্তুর দিকে তাকালেন। তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, হ্যাঁ, সন্তু এখন প্রায় হিরো হয়ে উঠেছে বটে। দুদিন বাদে তোমাকে-আমাকে টেক্কা দেবে! কিন্তু তোমার অসুখের সময় সন্তুকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমাকে আজই রওনা দিতে হবে।

আজ সকালে চার-পাঁচজন দেখা করতে এসেছে। কেউ মাসতুতো ভাই, কেউ পিসতুতো দাদা। একজন মহিলা মায়ের সঙ্গে ইস্কুলে পড়তেন। বহুদিন এঁদের দেখা যায়নি। কাকাবাবুর কথা মিলে গেছে, মা এঁদের চা ও মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন। তাই খেতে-খেতে এঁরা অন্যদের অসুখের গল্প করছেন।

মাঝখানের চেয়ারে গম্ভীরভাবে বসে আছেন একজন হৃষ্টপুষ্ট পুরুষ। কাকাবাবুর বয়েসী হবেন, মুখে মোটা গোঁফ আর চাপদাড়ি, বেশ দামি সুট পরা।

তিনি সকলের কথা শুনছেন, নিজে কিছু বলছেন না। আর সবাই একেএকে চলে যাওয়ার পর তিনি বললেন, আমিও এবার উঠব রাজা, শরীরের অযত্ন কোরো না। কিছুদিন বিশ্রাম নাও।

এরকম উপদেশ শুনতে-শুনতে কাকাবাবুর কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, তিনি কোনও উত্তর দিলেন না।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকটি আবার বললেন, শুধু ওষুধ খেলে অসুখ সারে না। এই রোগের আসল চিকিৎসা হল শুয়ে থাকা। অন্তত সাতদিন শুয়ে থাকতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, হুঁঃ!

লোকটি উঠে দাঁড়ালেন। যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। এ-ঘরে ঢোকার সময় সবাই বাইরে জুতো খুলে আসে, এঁর পায়ে চকচকে কালো জুত। বাঁ হাতটা আগাগোড়া কোটের পকেটেই ছিল, একবার বার করতেই সন্তু লক্ষ করল, সেই হাতটায় পাতলা রবারের দস্তানা পরা।

তিনি বললেন, তা হলে আমি চলি? কোনও দরকার-টরকার হলে আমাকে খবর দিয়ো। আমি সপ্তাহখানেক পরে আবার আসব।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যেতেই কাকাবাবু চোখের ইঙ্গিতে মাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইনি কে?

মা বললেন, জানি না তো। জন্মে দেখিনি।

কাকাবাবু বললেন, সে কী! আমিও তো চিনি না। আমি ভাবলাম, তোমাদের কোনও আত্মীয়-টাত্মিয় হবে বুঝি।

মা বললেন, আমিও তো ভেবেছি, তোমার কোনও বন্ধু!

কাকাবাবু বললেন, আমার বন্ধুর চেয়ে শত্রু বেশি। তুমি-তুমি বলে কথা বলল, যেন কতদিনের চেনা। অথচ আমি একেবারেই চিনতে পারলাম না? মুখভর্তি অবশ্য দাড়ি-গোঁফ।

চোখ বুজে কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন।

তারপর বললেন, উঁহুঃ, মনে পড়ছে না। সন্তু এক কাজ করতো। দেখে আয় তো লোকটা কোথায় যায়। সঙ্গে আর কেউ আছে কি না!

সন্তু দৌড়ে নীচে নেমে গেল।

ভদ্রলোকটি ততক্ষণে বাইরে বেরিয়ে পড়েছেন। বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি নেই। তিনি হাঁটতে লাগলেন বড় রাস্তার দিকে। সন্তু তাঁর পিছু নিল।

সন্তু ইচ্ছে করলে ছুটে গিয়ে ভদ্রলোকের সামনে দাঁড়াতে পারে। তারপর সে কী করবে? আপনার নাম কী, কোথা থেকে এসেছেন, কাকাবাবুকে আপনি কী করে চিনলেন, এসব কথা কি ওরকম একজন রাশভারী চেহারার লোককে জিজ্ঞেস করা যায়?

লোকটির দুটি হাতই এখন পকেটের বাইরে। বাঁ হাতের পাতলা দস্তানাটা সন্তুর আবার নজরে পড়ল। একজন লোক শুধু একহাতে দস্তানা পরে থাকে কেন?

সন্তু আর-একটু কাছে যেতেই ভদ্রলোক পেছন ফিরে তাকালেন এবং বাঁ হাতটা চট করে পকেটে ভরে ফেললেন।

সন্তু যেন কোনও জিনিস কিনতে বেরিয়েছে, এইরকম ভাব করে একটুখানি হাসল। ভদ্রলোক হাসলেনও না, কোনও কথাও বললেন না।

এইসময় একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল লোকটির কাছে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। ড্রাইভারটির মাথায় একটা খাকি রঙের টুপি।

ভদ্রলোক পেছনের দরজা খুলে উঠে পড়লেন গাড়িতে। তারপর সেটা চলতে শুরু করতেই জানলা দিয়ে কেমন যেন কটমট করে তাকালেন সন্তুর দিকে।

২. গরমকালে সাঁতার

আগে সন্তু প্রতি বছর গরমকালে সকালবেলায় সাঁতার কাটতে যেত। সাঁতারের প্রতিযোগিতায় দুবার পুরস্কারও পেয়েছে। এখন পড়াশুনোর চাপে আর সাঁতার কাটতে যাওয়া হয় না। সাঁতার ক্লাবের ছেলেরা তাকে মাঝে-মাঝে ডাকতে আসে।

আজ বালিগঞ্জ লেকে সন্তুদের সেই ক্লাবে একটা কবিতা পাঠের আসর হবে। নামকরা কবিরা এসে কবিতা পড়বেন। সন্তু সেই অনুষ্ঠানটা শুনতে যাবে ঠিক করে রেখেছিল, যাওয়ার আগে ভাবল, জোজোকেও নিয়ে গেলে হয়।

জোজো একেবারেই সাঁতার জানে না। জলে নামতেই ভয় পায়। মুখে অবশ্য তা স্বীকার করবে না। সাঁতারের কথা উঠলেই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, আরে আমি বসফরাস প্রণালী আর কাস্পিয়ান হ্রদে সাঁতার কেটে এসেছি। তোদের এখানকার এইসব ছোটখাটো সুইমিং পুলে কী নামব! আমার ঘেন্না করে?

জোজো খেলাধুলোও কিছু করে না, শুধু বই পড়ে। কবিতা পড়তেও ভালবাসে।

সন্তু ওর বাড়িতে গিয়ে ডাকতেই জোজো নেমে এল। ওর ডান পায়ের গোড়ালিতে একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা, একটু-একটু খোঁড়াচ্ছে।

কলেজে এখন গ্রীষ্মের ছুটি চলছে, তাই জোজোর সঙ্গে চার-পাঁচদিন দেখা হয়নি। সন্তু জিজ্ঞেস করল, তোর পায়ে কী হল রে?

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলল, এমন কিছু না। হেলিকপ্টার থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে একটা পা একটু মচকে গেছে।

সন্তু বলল, হেলিকপ্টার থেকে আবার কোথায় লাফালি?

জোজো বলল, বাঃ, এর মধ্যে আমাকে লাদাখ ঘুরে আসতে হল জানিস? খুব জরুরি কাজে যেতেই হল।

সন্তু বলল, লাদাখ? কাগজে দেখলাম সেখানে এখনও বরফ পড়ছে, সেখানে আবার তোর কী জরুরি কাজ?

জোজো বলল, বাবার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার অরিজিৎ সিং ওখানে পোস্টেড, হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুকে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। কোনও ডাক্তারই কিছু করতে পারেনি। তখন অরিজিৎ সিং বাবাকে ফোন করে কাতরভাবে বললেন, বন্ধু, তোমার কবিরাজি ওষুধ পাঠিয়ে আমাকে বাঁচাও। বাবা তখন খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাকে একটা গোপন কথা বলে দিচ্ছি সন্তু, কাউকে জানাবি না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন ভোটে জেতার জন্য বাবার কাছে একটা মাদুলি চেয়েছেন, বাবা সেইটা তৈরি করছিলেন। তাই বাবা বললেন, জোজো, তুই ওষুধটা পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবি? একটা লোককে বাঁচাবার জন্য আমাকে যেতেই হল। প্লেনে দিল্লি হয়ে শ্রীনগর, সেখানে আর্মির হেলিকপ্টার আমার জন্য অপেক্ষা করছিল।

তুই হেলিকপ্টার থেকে লাফাতে গেলি কেন?

আহা বুঝলি না, জীবন-মরণ সমস্যা। আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে অরিজিৎ সিংকে বাঁচানো যেত না। ওখানে তখন খুব বরফ পড়ছে, হেলিকপ্টারটা ল্যান্ড করতে পারছে না। তিরিশ ফুট ওপরে বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে, বরফের জন্য কিছু দেখাই যাচ্ছে না, আমি তখন জয় মা দুগা বলে জাম্প দিলাম। তোকে কী বলব সন্তু, ওষুধটায় ঠিক ম্যাজিকের মতন কাজ হল। একটা ট্যাবলেট খেয়েই অরিজিৎ সিং বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে নীচে নেমে এল, গোরিলার মতন নিজের বুক চাপড়ে বলতে লাগল, সব ঠিক হহো গিয়া, বিলকুল ঠিক হো গিয়া!

গল্পটা হজম করে নিয়ে সন্তু বলল, বাঃ, ভাল কাজ করেছিস। কিন্তু একটা মুশকিল হল, তুই তো হাঁটতে পারবি না। ভেবেছিলাম তোকে আমাদের সাঁতারের ক্লাবে কবিতা পাঠ শোনাতে নিয়ে যাব।

জোজো চোখদুটো গোল-গোল করে বলল, সাঁতারের ক্লাবে কবিতা পাঠ? এরকম অদ্ভুত কথা জীবনে শুনিনি!

সন্তু বলল, কেন, যারা সাঁতার কাটে, তারা বুঝি কবিতা পড়তে বা কবিতা শুনতে পারে না? যারা ক্রিকেট খেলে, তারা কি গান শোনে না? যারা গান গায় কিংবা কবিতা লেখে, তারা কি খেলা দেখে না?

জোজো বলল, বাংলায় একটা কথা আছে, যে রাঁধে, সে কি চুল বাঁধে না?

সন্তু বলল, আমার মা রান্না করেন, চুলও বাঁধেন। চুল বাঁধতে বাঁধতে গান করেন, আর রাঁধতেরাঁধতে উপন্যাস পড়েন।

তা হলে সত্যিই তোদের ক্লাবে কবিতা পড়া হচ্ছে? আমি ভেবেছিলাম, তুই গুল মারছিস!

ভাই জোজো, গুল মারার কায়দাটাই আমি জানি না। ওটা পুরোপুরি তোর ডিপার্টমেন্ট।

হাঁটতে আমার অসুবিধে হচ্ছে, কিন্তু সাইকেল চালাতে পারি। চল, যাই তা হলে!

সন্তুও সাইকেল নিয়ে এসেছে। দুই বন্ধু বেরিয়ে পড়ল।

খানিকদূর যাওয়ার পরেই জোজো বলল, এই যাঃ, মানিব্যাগটা ফেলে এলাম যে। কী হবে?

সন্তু বলল, তাতে কী হয়েছে? টাকা-পয়সার তো দরকার নেই, ওখানে টিকিট কাটতে হবে না।

জোজো বলল, সেজন্য নয়। একটা করে চিকেন কাটলেট খেয়ে নেওয়া যেত। বিকেলবেলা কিছু খাইনি। খালি পেটে কি কবিতা শোনা যায়?

সন্তু বলল, তাই বল, তোর কাটলেট খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। ঠিক আছে, আমার কাছে টাকা আছে।

জোজো বলল, আমি কিন্তু খাওয়াব। টাকাটা তোর কাছে ধার রইল।

লেক মার্কেটের কাছে একটা দোকানের চপ কাটলেট খুব বিখ্যাত। দোকানটায় বেশ ভিড়। ভেতরে বসে খাওয়ার জায়গা নেই। দুখানা কাটলেট নিয়ে ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে খেতে লাগল।

খেতে-খেতে জোজো বলল, আমার পা-টা যখন মুচকে গেল, জানিস, প্রথম দুদিন এমন ব্যথা যে, আমি উঠে দাঁড়াতেই পারছিলাম না। ভয় হয়েছিল, সারাজীবনের মতনই খোঁড়া হয়ে যাব নাকি! তখন কাকাবাবুর কথা খুব মনে পড়ত। কাকাবাবু ওই খোঁড়া পা নিয়েই কতবার পাহাড়ে উঠেছেন, জলে ঝাঁপিয়েছেন, হ্যাঁ রে সন্তু, কবে থেকে খোঁড়া হয়েছেন বল তো?

সন্তু বলল, আমি ঠিক জানি না। ছেলেবেলা থেকেই তো এরকম দেখছি।

কীভাবে পা-টা ওরকমভাবে খোঁড়া হল?

তাও ঠিক জানি না। কখনও জিজ্ঞেস করিনি।

কেন জিজ্ঞেস করিসনি? তুই বড় হওয়ার আগে কাকাবাবু নিশ্চয়ই একা-একা অনেক অভিযানে গেছেন। সেই গল্পগুলো শুনিসনি?

দু-একটা শুনেছি।

তা হলে এই পা ভাঙা নিয়েও নিশ্চয়ই কোনও গল্প আছে। তুই জিজ্ঞেস করতে না পারিস, আমি করব।

হ্যাঁ, কর না। কাকাবাবু তোকে খুব পছন্দ করেন।

কাটলেট খাওয়া হয়ে গেছে। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জোজো ডান পাশে তাকাল। কাছেই দাঁড়িয়ে আছে এক আইসক্রিমওয়ালা।

জোজো বলল, কাটলেটের পর একখানা আইসক্রিম না খেলে কি জমে, বল?

সন্তু বলল, চল, চল, আর আইসক্রিম খেতে হবে না। ওখানে যেতে দেরি হয়ে যাবে।

জোজো অভিমানের ভান করে বলল, সন্তু, আমি পয়সা আনিনি বলে তুই এরকম অবজ্ঞা করছিস? একটা আইসক্রিম খেতে কতটা সময় লাগে? আইসক্রিমের পয়সাটাও তোর কাছে আমার ধার থাকবে।

সন্তু বলল, এটা সত্যিই ধার। আমার হাতখরচ ফুরিয়ে যাচ্ছে।

আইসক্রিম শেষ করে ওরা এসে পৌঁছল সাঁতার ক্লাবে। সেখানে বেশ ভিড়। কবিতা পাঠ শুরু হয়ে গেছে। একজন লম্বা চেহারার কবি উদাত্ত কণ্ঠে কবিতা পাঠ করছেন।

ওরা দুজনে বসল একেবারে পেছন দিকে। একটু পরেই জোজো ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে সন্তু, এরা আমাকে একটা কবিতা পড়তে দেবে?

সন্তু বলল, না।

জোজো বলল, কেন দেবে না, আমিও কবিতা লিখি।

সন্তু বলল, কবিতা লিখলেই কবি হওয়া যায় না। যে খেলে, সে-ও খেলোয়াড় নয়। যে গান গায়, সেই কি গায়ক?

জোজো ভুরু কুঁচকে একটু চিন্তা করে বলল, তোর কথাটা সত্যি বটে, আবার সত্যিও নয়। এ-নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে।

সন্তু বলল, এখন তর্ক করতে হবে না। মন দিয়ে শোন।

দু-তিনজনের কবিতা শোনার পরই জোজো বলল, ওঠ, উঠে পড়। চল, এবার যাই!

সন্তু বলল, তোর ভাল লাগছে না?

জোজো বলল, হ্যাঁ ভাল লাগছে। সত্যি ভাল লাগছে। কিন্তু ভাল জিনিস বেশিক্ষণ শুনতে নেই। এর পর যদি খারাপ লাগে?

জোজো হাত ধরে টানাটানি করাতে সন্তুকে উঠে পড়তেই হল।

বাইরে এসে জোজো বলল, চল, তোদের বাড়ি যাই। কাকাবাবুর অসুখ, আমার একবারও দেখতে যাওয়া হয়নি।

সন্ধে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। আকাশে জমেছে কালো মেঘ, মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে গুরুগুরু শব্দ। বেশ ঝড়-বৃষ্টি আসছে।

বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামার পর জোজো গলা নিচু করে বলল, সন্তু, সন্তু, একজন স্পাই! তোদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

সন্তু তাকিয়ে দেখল, উলটো ফুটপাথে বেশ খানিকটা দূরে একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোক দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে আপনমনে।

সে বলল, ধুত! তুই সব জায়গায় স্পাই দেখতে পাস। লোকটা নিশ্চয়ই কারও জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার কী আছে?

জোজো মাথা নাড়তে-নাড়তে বলতে লাগল, উঁহুঃ, উঁহুঃ, আমি স্পাই দেখলেই চিনতে পারি।

লোকটি এবার উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল। সন্তুও জোজোকে নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

মা জোজোকে দেখে খুশি হয়ে বললেন, জোজো অনেকদিন আসোনি। ভাল হয়েছে আজ এসেছ। আজ মাছের চপ বানিয়েছি, এক্ষুণি ভেজে দিচ্ছি।

জোজো বলল, আঃ মাসিমা, বাঁচালেন, কী খিদেটাই না পেয়েছে।

সন্তু অবাক হয়ে তাকাতেই জোজো আবার বলল, মনে হচ্ছে যেন কতদিন কিছু খাইনি।

ব্যান্ডেজ বাঁধা পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হচ্ছে জোজোর, সন্তু তাকে ধরে-ধরে তুলল। উঠতে উঠতে জোজো বলল, আমি পেটুক নই, জানিস তো! এক একদিন রাক্ষসের মতন খিদে পায়, আবার সাতদিন কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। একবার আমি অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে তিনদিন একফোঁটা জলও না খেয়ে দিব্যি কাটিয়ে দিয়েছি।

কাকাবাবুর ঘরের দরজা ভেজানো। কাকাবাবু বিরক্ত হয়ে বলে দিয়েছেন। যে, আর কোনও লোককে তাঁর অসুখ দেখার জন্য তাঁর ঘরে আসতে দেওয়া হবে না। যারা এখনও আসছে, তাদের বৈঠকখানা ঘরে বসিয়ে চা-টা খাইয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একগাদা ওষুধ খেয়ে-খেয়ে কাকাবাবুর শরীরটা বেশ দুর্বল হয়ে গেছে। বাইরের লোকের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করে না।

জোজোর কথা অবশ্য আলাদা। তাকে দেখে কাকাবাবু খুশিই হলেন। হেসে বললেন, এসো, এসো জোজো, অনেক দিন তোমার গল্প শোনা হয়নি।

জোজো বলল, কাকাবাবু, অনেকদিন কোথাও অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া হচ্ছে না!

কাকাবাবু বললেন, আমার তো শরীর ভাল নয়। তুমি আর সন্তু কোনও জায়গা থেকে ঘুরে এসো এই ছুটিতে। দ্যাখো, যদি কোনও অ্যাডভেঞ্চার হয়!

সন্তু বলল, জোজো, তোর হেলিকপ্টার থেকে লাফানোর গল্পটা কাকাবাবুকে শুনিয়ে দে!

জোজো বলল, ওটা এমন কিছু না।

কাকাবাবু বললেন, শুনব, শুনব। কিন্তু তার আগে সন্তু বল তো, কালকের ওই লোকটা কে ছিল? মনে একটা খটকা লেগে আছে। আমি চিনি না, আর কেউ চেনে না, অথচ ঘরের মধ্যে গাট হয়ে বসে রইল। আমাকে তুমি-তুমি করে উপদেশ দিয়ে গেল! লোকটার আর হদিস পেলি না?

সন্তু বলল, লোকটি তো বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুখানি হাঁটবার পরই একটা গাড়িতে উঠে পড়ল। আর দেখতে পাইনি।

কাকাবাবু একটু ধমকের সুরে বললেন, শুধু এইটুকু দেখেছিস? আর কিছু দেখিসনি? এইটুকু সময়ের মধ্যেই অনেক কিছু দেখা যায়। লোকটার হাঁটার ভঙ্গি কেমন ছিল? যে-গাড়িটায় উঠল, তার নম্বর কত?

সন্তু লজ্জা পেয়ে গেল। গাড়িটার নম্বর দেখতে সে ভুলে গেছে। কালো রঙের গাড়ি তো অনেক আছে।

সন্তু বলল, হাঁটার ভঙ্গিতে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। সোজা হয়ে হাঁটছিল। তবে বাঁ হাতটা কোটের পকেটে ঢোকানো ছিল, একবার-দুবার মাত্র বার করেছিল, সেই হাতে একটা দস্তানা পরা।

কাকাবাবু বললেন, দস্তানা? কীরকম দস্তানা?

সন্তু বলল, খুব পাতলা রবারের। ডাক্তাররা যেমন পরে।

কাকাবাবু বললেন, একহাতে দস্তানা পরে থাকবে কেন? হয় ওই হাতে কোনও ঘা আছে কিংবা একটা-দুটো আঙুল কাটা। তা লুকোতে চায়।

সন্তু বলল, আর একটা ব্যাপার, গাড়িতে ওঠার পর লোকটি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়েছিল। পরে আমার মনে হয়েছে, ওর চোখের মধ্যে যেন অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে।

কাকাবাবু বললেন, ওর চোখে কালো চশমা ছিল, তুই কী করে বুঝলি, কটমট করে তাকিয়েছে?

সন্তু বলল, তখন চশমা খুলে ফেলেছিল। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল আমার দিকে...

কাকাবাবু বললেন, আর-একটু ভেবে দ্যাখ, কেন অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল?

সন্তু বলল, কয়েক সেকেন্ডের তো ব্যাপার, গাড়িটা হুশ করে চলে গেল, তার মধ্যেই লোকটা... কাকাবাবু, মনে পড়েছে, ওর দুটো চোখ দুরকম!

কাকাবাবু বললেন, তার মানে? দুচোখের রং আলাদা?

সন্তু বলল, তা দেখিনি। অত তাড়াতাড়ি কি রং বোঝা যায়? তবু এটা আমার ধারণা, দুচোখের দৃষ্টি একরকম নয়!

জোজো জানলার ধার থেকে বলে উঠল, একটা চোখ পাথরের হতে পারে।

কাকাবাবু জোজোর দিকে প্রশংসার চোখে তাকিয়ে বললেন, এটা তো জোজো ঠিক বলেছে। একটা চোখ পাথরের হলে... সেইজন্যই লোকটা ঘরের মধ্যেও কালো চশমা পরে ছিল। কিন্তু... কিন্তু, পাথরের চোখওয়ালা কোনও লোক, এক চোখ কানা, এরকম কোনও লোককেও তো আমি চিনি না! অবশ্য, পাথরের চোখ হলেই যে সে খারাপ লোক হবে, তার কোনও মানে নেই!

বাইরের দিকে তাকিয়ে জোজো বলল, সেই লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, সেই লোকটা মানে কোন লোকটা? তাকে তো জোজো দেখেনি।

সন্তু বলল, জোজোর ধারণা একজন স্পাই আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখছে।

কাকাবাবু এবার হেসে ফেলে বললেন, আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখার কী আছে? এটা এমন কিছু আহামরি বাড়ি নয়!

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কাকাবাবু বললেন, কী? তোমার আবার অনুমতি লাগে নাকি?

জোজো বলল, আপনার একটা পা খোঁড়া হয়ে গেল কী করে? কেউ কি পায়ে গুলি করেছিল?

কাকাবাবু বললেন, ও, এই কথা। না, কেউ গুলি করেনি। প্রায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলতে পারো। একবার আফগানিস্তানে গিয়েছিলাম একটা কাজে, এক জায়গায় গড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলাম পাহাড় থেকে। অনেক চিকিৎসাতেও সারেনি।

জোজো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, শুধু এইটুকু বললে চলবে না। ঠিক কী হয়েছিল, কেন পাহাড় থেকে পড়ে গেলেন, সবটা শুনতে চাই।

কাকাবাবু বললেন, পুরো কাহিনীটা তোমাকে শোনাতে হবে? তাতে যে অনেকটা সময় লাগবে। ঘটনাটা আমি কাউকে সাধারণত বলি না।

জোজো জোর দিয়ে বলল, আমাদের বলুন। সময় লাগুক না!

কাকাবাবু এতক্ষণ বসে ছিলেন। এবার বালিশে মাথা হেলান দিলেন। তারপর বললেন, আফগানিস্তান দেশটা এক সময় কী সুন্দর ছিল। মানুষগুলো লম্বা-চওড়া, কিন্তু ভারী

সরল। ওরা যদি কারও বন্ধু হয়, তবে সেই বন্ধুর জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে। আবার কেউ যদি শত্রু হয়, তবে দারুণ নিষ্ঠুরভাবে তাকে খুন করতেও ওদের হাত কাঁপে না। কোনও কাবুলিওয়ালার সঙ্গে আমার শত্রুতা হয়নি, বরং বন্ধু হয়েছিল অনেক।

জোজো জিজ্ঞেস করল, ওখানে আপনি কত বছর আগে গিয়েছিলেন?

কাকাবাবু বললেন, দশ বছর, না, না, এগারো। তখন তোমরা খুব ছোট ছিলে। এখন ওদেশটায় খালি মারামারি চলছে, অন্য দু-একটা দেশ গোলমাল পাকাচ্ছে। এখন তো আর যাওয়াই যায় না। আমার আর-একবার খুব যেতে ইচ্ছে করে।

এই সময় রঘু থালাভর্তি গরম-গরম মাছের চপ নিয়ে এল।

একটা কাগজের প্লেটে দুটো চপ তুলে কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, মা আপনাকে আগে খেয়ে নিতে বলেছেন। ঠাণ্ডা হয়ে গেলেই তো বলবেন, খাব না!

কাকাবাবু বললেন, তা বলে দুটো? পারব না, একটা দে। রঘু বলল, বেশি বড় নয়, দুটোই খান!

এত ওষুধের জন্য কাকাবাবুর মুখে রুচি নেই, কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। মা তাই প্রত্যেকদিন কাকাবাবুর জন্য নতুন-নতুন খাবার তৈরি করছেন।

জোজো দুহাতে দুটো চপ তুলে নিয়ে একটায় কামড় দিয়ে বলল, গ্র্যান্ড, গ্র্যান্ড, দারুণ! আগে খেয়ে নিই, তারপর আফগানিস্তানের গল্পটা শুনব।

সন্তু একটা চপ নিয়ে জানলার কাছে চলে এল। পুরনো আমলের বাড়ি, জানলায় গ্রিল নেই, ফাঁক-ফাঁক লোহার শিক। শুধু এই জানলার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় ছবি তুললে মনে হবে, জেলখানার গরাদের মধ্যে কয়েদি!

সন্তু জোজোর সেই স্পাই-কে দেখার চেষ্টা করল। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটা সত্যিই ফিরে এসেছে, আস্তে-আস্তে পায়চারি করছে। বৃষ্টি পড়ছে ফোঁটা-ফোঁটা।

হঠাৎ একটা কালো রঙের গাড়ি এসে থামল। জানলা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা হাত। সেই হাতে একটা বন্দুক। সাধারণ বন্দুকের মতন লম্বা নয়, বেশ বেঁটে, নলটা অনেকটা মোটা। ঠিক গুলির শব্দের মতন নয়, চাপা ধরনের দুপ-দুপ শব্দ হল দুবার।

কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। গাড়ির জানলায় বন্দুকসুন্ধু হাতটা দেখেই সন্তু মাথা নিচু করে বসে পড়েছে মাটিতে, চেঁচিয়ে উঠল, সাবধান!

সঙ্গে-সঙ্গে একটা কিছু ঠং করে জানলার শিকে লেগে পড়ে গেল রাস্তার দিকে, আর-একটা এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। সেটা গুলি নয়, একটা ছোট টিনের কৌটোর মতন, তার থেকে ভস-ভস করে বেরোতে লাগল ধোঁয়া।

কাকাবাবু বিদ্যুদ্বেগে নেমে এলেন খাট থেকে। একহাতে নিজের নাক টিপে ধরে তুলে নিলেন কৌটোটা।

লাফাতে-লাফাতে চলে গেলেন বাথরুমে। সেখানে এক বালতি জল ছিল, তার মধ্যে কৌটোটা ডুবিয়ে দিলেন।

যেটুকু গ্যাস বেরিয়েছে, তাতেই মাথা ঝিমঝিম করছে সন্তুর। জোজো ঢলে পড়েছে মাটিতে।

অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগে সন্তু শুনতে পেল, বাইরের রাস্তায় গুড়ম-গুড়ম করে শব্দ হল দুবার। এবারে সত্যিকারের রিভলভারের গুলি ছোড়ার শব্দ।

তারপরই একজন মানুষের আর্ত চিৎকার।

৩. পরদিন সকালে অনেকখানি জানা গেল

পরদিন সকালে অনেকখানি জানা গেল ঘটনাটা।

বিষাক্ত ধোঁয়ায় সন্তু আর জোজো জ্ঞান হারালেও কাকাবাবু ঠিক ছিলেন। তিনি ওদের চোখে-মুখে জলের ছিটে দেওয়ায় একটু পরেই জ্ঞান ফিরেছিল। তারপর রাত্রে আর কিছু ঘটেনি। রাস্তায় গুলিটুলি চললেও কারও কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। জোজোকে আর রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেওয়া হয়নি, সে ফোনে জানিয়ে দিয়েছিল।

সকালবেলাতেই নরেন্দ্র ভার্মা এসে হাজির। যত বড় ঘটনাই ঘটুক, তবু তাঁর হালকা ইয়ার্কির সুরে কথা বলা স্বভাব। তাঁর পোশাকও সবসময় নিখুঁত, ভাঁজটাজ লাগে না। মেরুন রঙের সুট তাঁর বেশি পছন্দ।

তিনি এসে কাকাবাবুকে বললেন, আঃ রাজা, তোমাকে নিয়ে পারা যায় না। তোমার জন্য কি কলকাতার লোক শান্তিতে থাকতে পারবে না?

কাকাবাবু বললেন, আমি আবার কলকাতার লোকের কাছে কী দোষ করলাম?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তোমার বাড়ির সামনে গোলাগুলি চলে, তাতে পাড়ার লোকের ঘুম নষ্ট হয় না? একগাদা শত্রু তৈরি করে রেখেছ, কে যে কখন তোমাকে মারতে আসবে, তার কি কোনও ঠিক আছে?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কাল কারা এসে হামলা করল, তুমি কিছু জানো?

কী করে জানব, আমি কি তখন উপস্থিত ছিলাম! নাগাল্যান্ড থেকে ফিরেছি অনেক রাতে। তখনই খবর পেলাম।

কী করে তুমি অত রাতে খবর পেলে? কে খবর দিল?

পুলিশ খবর দিয়েছে। তোমার অসুখ দেখেই আমার আশঙ্কা হয়েছিল, এবার তোমার ওপর একটা অ্যাটেমপ্ট হতে পারে। সুস্থ অবস্থায় তোমার শত্রুরা তোমাকে কঞ্জা করতে পারে না। তুমি দুর্বল হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকলে তোমাকে মারবার চেষ্টা করবে। সেইজন্যই তোমার বাড়ির ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার জন্য আমি পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম। কাল রাতে দুটোর সময় এসে এই রাস্তাটা আমি একবার দেখেও গেছি।

সন্তু জোজোর দিকে তাকাল। জোজো যাকে স্পাই ভেবেছিল, সে আসলে পুলিশের লোক!

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, তোমার ঘরের মধ্যে দুটো গ্যাস বোমা ছুড়ে চলে গেল। একটা বোমা তাও ঘরের মধ্যে পড়েনি, শিকে লেগে বাইরে পড়েছে। যদি দুটোই ঘরের মধ্যে এসে পড়ত, আর পাঁচ-সাত মিনিট গ্যাস বেরোত, তা হলে তোমরা তিনজনেই বাঁচতে না!

কাকাবাবু বললেন, আমার ওপর কার যে এত রাগ তা তো বুঝতে পারছি না। আমি তো কয়েক মাস ধরেই চুপচাপ বসে আছি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, পুরনো শত্রুরা প্রতিশোধের জন্য পাগল হতে পারে? তোমার দোষ কি জানো রাজা, তুমি সাঙ্ঘাতিক-সাঙ্ঘাতিক লোকগুলোকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দাও, ক্ষমা করে দাও। কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না!

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, তবু দেখলে তো, আমাকে মারা সহজ নয়!

নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে-হাসতে বললেন, একবার-না-একবার ঠিক ঘায়েল হয়ে যাবে, এই আমি বলে দিচ্ছি!

সন্তু বলল, নরেন্দ্রকাকা, কাল রাস্তায় কেউ কি রিভলভারের গুলি ছুড়েছিল? আমি শব্দ শুনেছি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, আমাদের পুলিশের লোকটি ছুড়েছিল। একজনের গায়েও লেগেছে। কিন্তু কালো গাড়িটাকে আটকাতে পারেনি। আহত লোকটাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। গাড়ির নাম্বারটা নোট করেছিল সেই পুলিশ, কিন্তু বুঝতেই পারছ, সেটা ফল্স। চেক করে দেখা গেছে, ওই নাম্বারে কোনও গাড়ি নেই।

কাকাবাবু বললেন, গ্যাস বোমা। আইডিয়াটা নতুন। ছাত্র বয়েসে আমরা দেখেছি, পুলিশে টিয়ার গ্যাস বোমা ছুড়ত। দারুণ চোখ জ্বালা করত তাতে। আমি প্রথমে সেরকমই ভেবেছিলাম।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, রাজা, আগেকার দিনে লোকে অসুখে পড়ার পর চেইঞ্জে যেত মনে আছে? হাওয়া বদলালে উপকার হয়। কলকাতার হাওয়া ছেড়ে তুমি কিছুদিন অন্য জায়গার হাওয়া খেয়ে এসো বরং। এবাড়িতে আবার হামলা হলে তোমার দাদা-বউদিও বিপদে পড়তে পারেন!

কাকাবাবু বললেন, কে আমাকে মারার চেষ্টা করছে সেটা বুঝতে পারলে তাকে ধরে ফেলা শক্ত হত না। যাই হোক, এখন কিছুদিন এবাড়ি থেকে দূরে থাকাই ভাল। জানো তো নরেন্দ্র, আমি আমার দাদাকে অনেকবার বলেছি, আমার জন্য যাতে তোমাদের বিপদে না পড়তে হয়, সেইজন্য আমার অন্য বাড়িতে থাকা উচিত। সল্ট লেকে একটা বাড়ি ঠিকও করেছিলাম। দাদা কিছুতেই যেতে দিলেন না। বউদিরও খুব আপত্তি।

সন্তু বলল, আমারও।

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে বললেন, সন্তু মাস্টার, এখন তো কলেজে সামার ভ্যাকেশন। তোমার কাকাকে নিয়ে কোথাও ঘুরে এসো। জোজো, তুমিও যাবে নাকি?

জোজো বলল, বাবার সঙ্গে আমার হাওয়াই যাওয়ার কথা আছে। সেখান থেকে তাহিতি দ্বীপে। সামনের সোমবারই স্টার্ট করার কথা।

কাকাবাবু বললেন, ওরে বাবা, আমরা তো অতদূরে যেতে পারব না। কাছাকাছি কোনও জায়গা ঠিক করা যাক।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, পুরীতে যেতে পারো। সমুদ্রের ধারে। আর যদি পাহাড় যেতে চাও, কালিম্পং-এ ব্যবস্থা করে দিতে পারি। কিংবা দিল্লি কিংবা বম্বে (খুড়ি মুম্বই) তো যাওয়ার ইচ্ছে হয়, আমার মতে দিল্লিতে যাওয়াটাই ভাল, আমি কাছাকাছি থাকব।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, সাতনা! মধ্যপ্রদেশে সাতনা নামে একটা জায়গা আছে জার ধ?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, জানব না কেন? খাজুরাহো যাওয়ার রাস্তায় পড়ে। তুমি সেখানে যেতে চাও? মধ্যপ্রদেশে তো এখন খুব গরম।

কাকাবাবু বললেন, গরমে আমার কিছু আসে যায় না। কলকাতা কি কম গরম নাকি? দিল্লি আরও গরম। নরেন্দ্র, তোমার কামালুদ্দিন হোসেনকে মনে আছে? আমরা যাকে কামাল আতাতুর্ক বলে ডাকতাম?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে। তোমার সঙ্গে আফগানিস্তানে গিয়েছিল। ওর আর-একটা নাম ছিল কাটমিনস্কি। অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে কাটমিনস্কি ছিল, যে-কোনও সময়ে যে-কোনও জিনিস চাইলে যে জোগাড় করে আনত, আমাদের কামালুদ্দিনেরও সেই গুণ ছিল। সে বুঝি এখন সাতনায় থাকে?

কাকাবাবু বললেন, সেইরকমই তো জানি। ওখানে কামাল ব্যবসা করে। অনেকদিন যোগাযোগ নেই। ওকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সাতনায় একটা ভাল হোটেল আছে। ডাক বাংলো বা গেস্ট হাউসেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, হোটেলের চেয়ে আলাদা গেস্ট হাউসই ভাল। সন্তু, তোকে খাজুরাহোর মন্দিরও দেখিয়ে আনব।

জোজো বলে উঠল, তা হলে আমি আর হাওয়াই-তাহিতি দ্বীপে যাব না। আমিও সাতনায় যেতে চাই।

সন্তু বলল, সে কী রে? শুনেছি হাওয়াই অতি চমৎকার জায়গা।

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, ওসব জায়গায় আমি যে-কোনও সময় যেতে পারি। এবার তোদের সঙ্গে বরং খাজুরাহো মন্দির দেখে আসি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তা হলে ওই ঠিক হল। কালই ভোরবেলায় যাত্রা শুরু। আজ রাতটা সাবধানে থাকবে। আজ অবশ্য একগাড়ি ভর্তি পুলিশ পাহারা দেবে এই বাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, তুমি যে নাগাল্যান্ডে গিয়েছিলে, সেখানে কী হল?

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ওখানে সীমান্তের ওপার থেকে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র চালান করছে একটা দল। সেই গ্যাংটাকে ধরার কথা ছিল। কিন্তু তোমাকে নিয়ে যাওয়া গেল না, তাই সুবিধে হল না।

কাকাবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে গেলে কী সুবিধে হত? আমি অস্ত্র চালানটালান ব্যাপারে কিছুই জানি না।

নরেন্দ্র ভার্মার ঠোঁটের কোণে একটু ঝিলিক দিয়ে গেল। তিনি বললেন, কী সুবিধে হত জানো? একফোঁটা মধু ফেললে যেমন অনেক মাছি উড়ে আসে, সেইরকম তুমি যেখানেই যাও, সেখানকার দুবৃত্তদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তোমাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা

ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তোমাকে মারতে এলে আগে থেকে ফাঁদ পেতে তাদের সবকটাকে জালে ফেলা যায়। তুমি গেলে না, তাই তারাও দূরে-দূরে রইল।

কাকাবাবু তেড়ে উঠে বললেন, ও, তার মানে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করো তোমরা? আমার প্রাণের কোনও দাম নেই তোমাদের কাছে?

নরেন্দ্র ভার্মা একটু সরে গিয়ে জোরে-জোরে হাসতে-হাসতে বললেন, দেশের উপকারের জন্য প্রাণ দেবে, এটা তো পুণ্য কাজ!

কাকাবাবু বললেন, মোটেই আমার প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তোমাদের কাজে আর কোথাও যাব না!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, কাল ভোরের সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সবাই রেডি থাকবে।

পরদিন হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে চাপার বদলে ওরা একটা গাড়িতে রওনা হল খঙ্গপুরের দিকে। সাবধানের মার নেই। ট্রেন ধরা হবে খঙ্গপুর থেকে।

গাড়ি যখন বিদ্যাসাগর সেতু পার হচ্ছে, তখন জোজো বলল, কাকাবাবু, সেদিন আর আফগানিস্তানের গল্পটা শেষ হল না। এখন বলুন।

কাকাবাবু বললে, সাতনায় গিয়ে বলব। সেইজন্যই তো কামালের কথা মনে পড়ল। সে আমার সঙ্গে ছিল। সব কথা নিজের মুখে বলা যায় না। কিছুটা কামালের কাছ থেকে শুনবে। আমরা দুজনে একসময় সহকর্মী ছিলাম। কামালকে তোমাদের ভাল লাগবে।

দুপুরের আগেই পৌঁছে যাওয়া গেল খঙ্গপুরে। সেখানে লাঞ্চ খাওয়া হল। পুলিশের এস. পি. সাহেবের বাংলোতে। নরেন্দ্র ভার্মা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, কিন্তু নিজে আসেননি। তিনি ব্যস্ত মানুষ, দিল্লি ফিরে গেছেন।

বিকেলবেলা ট্রেনে ওঠার সময় জোজো যথারীতি একজন স্পাইকে দেখে ফেলেছে।

কাকাবাবু বললেন, বলা যায় না। স্পাইয়ের ব্যাপারে জোজো এক্সপার্ট। সন্তু, নজর রাখিস। আমি ট্রেনে বই পড়ব, আর ঘুমোব।

ওদের টিকিট হয়েছে একটা ফার্স্ট ক্লাস বগিতে। একটা কিউবিল-এ চারটে বার্থের মধ্যে তিনটি ওদের তিনজনের, অন্য বার্থটিতে একজন মহিলা। মাঝবয়েসী মহিলাটি কেমন যেন গোমড়ামুখো, একটা পত্রিকা খুলে পড়তে লাগলেন। ট্রেন ছাড়ার একটু পরেই তিনি উঠে গেলেন বাইরে, তারপর একজন টাকমাথা বেঁটে লোক এসে সেখানে বসে চেয়ে রইল জানলার বাইরে।

সেই লোকটিও মিনিটপাঁচেক পরে ধড়মড়িয়ে উঠে চলে গেল, আর সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকল একজন দাড়িওয়ালা লম্বা লোক। লোকটি বেশ ট্যারা। এই লোকটিকে দরজার কাছে দেখেই ট্রেনে ওঠার সময় জোজো স্পাই বলে শনাক্ত করেছিল।

জোজো সন্তুর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

কাকাবাবু ওপরের বাঙ্কে শুয়ে বই পড়তে-পড়তেও এইসব লোকজনদের আসা-যাওয়া লক্ষ করছেন।

ট্যারা লোকটি প্যান্ট ও হাফশার্ট পরা, বসে পড়েই পা দোলাতে লাগল জোরে-জোরে। উলটো দিকেই সন্তু ও জোজো পাশাপাশি। লোকটি ওদের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু কোনও কথা বলছে না। অথচ কিছু যেন বলতে চায়।

সন্তু নিয়ে এসেছে হেমেন্দ্রকুমার রায়ের রচনাবলী। যখের ধন, আবার যখের ধন-এর মতন পুরনো লেখাগুলো তার আবার পড়তে ইচ্ছে করে। মাঝে-মাঝে হাসি পায়। জোজো তাকে পড়তে দিচ্ছে না, মাঝে-মাঝেই হাঁটুতে ধাক্কা মারছে।

ট্যারা লোকটি একসময় সন্তুর দিকে চেয়ে বলে উঠল, ইয়ে, তোমরা ভাই। কতদূর যাবে?

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো ফস করে বলে দিল, কন্যাকুমারিকা!

ওপরের বাঙ্কে কাকাবাবু খুক করে একটু হেসে ফেললেন। জোজো তার স্পাইটিকে ভারতের শেষ সীমা পর্যন্ত দৌড় করাতে চায়। এই ট্রেন যাবে মোটে জব্বলপুর পর্যন্ত।

লোকটি খানিকটা অবাক হয়ে বলল, এই ট্রেন কি অতদূর যাবে?

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, মাঝপথে নামতে হবে, আমাদের কাজ আছে।

এই লোকটিও উঠে চলে গেল বাইরে।

জোজো বলল, দেখলি, দেখলি, সন্তু, আমাদের কাছ থেকে খবর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কেমন গুলিয়ে দিলাম।

ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, তোমরাও লোকটিকে জিজ্ঞেস করলে না কেন, আপনি কতদূর যাবেন? সেটাই ভদ্রতা।

জোজো বলল, সেটা সন্তুর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। আমি ডিফেন্সে খেলি।

আরও একজন লোক এল এর পর। কোঁচানো ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, মাথার চুল ঢেউখেলানো, নাকের নীচে সরু তলোয়ারের মতন গোঁফ। গায়ের রং ফরসা, গুনগুন করে গান গাইছে।

এই লোকটি বেশ হাসিখুশি ধরনের। বসে পড়েই বলল, নমস্কার। আমাদের দলের মোট নখানা টিকিট, তার মধ্যে একখানা আপনাদের এখানে। এই সিটে কে বসবে তা ঠিক করতে পারছে না। আপনাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?

কাকাবাবু বললেন, না, বসুন না! আপনাদের যাত্রাপার্টি বুঝি?

লোকটি বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, বাগদেবী অপেরা। জব্বলপুরে পাঁচটা শো আছে।

সন্তু আর জোজো দুজনেই অবাক হল। কাকাবাবু কী করে বুঝতে পারলেন?

কাকাবাবু লোকটিকে বললেন, আপনি যে গানটি গাইছিলেন, সেটা কদমতলায় কে এসেছে হাতেতে তার মোহন বাঁশি তাই না? ছেলেবেলায় আমি খুব যাত্রা শুনতাম। এখন কি আর এইসব পুরনো পালা চলে?

লোকটি বলল, এখন লোকে আবার আগেকার অনেক পালা দেখতে চাইছে। নতুনগুলো একঘেয়ে হয়ে গেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই বুঝি হিরো? আপনার নাম কী?

লোকটি হেঁ-হেঁ করে হেসে বলল, আমার বাপ-মায়ের দেওয়া নাম যাদুগোপাল চক্রবর্তী, কিন্তু এ-লাইনে ওরকম নাম চলে না। তাই ডালিমকুমার নাম নিয়েছি।

কাকাবাবু বললেন, ডালিমবাবু, আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব খুশি হলাম। আপনি নামকরা লোক। আপনি ওই গানটা ভাল করে শোনান না!

ডালিমকুমার দুহাত নেড়ে মেজাজে গান ধরলেন। কাকাবাবুও খুব তারিফ করতে লাগলেন হাততালি দিয়ে দিয়ে। সন্তু আর জোজোর মোটেই ভাল লাগল না। কেমন যেন নাকি-নাকি সুর।

গানটা হঠাৎ এক জায়গায় থামিয়ে ডালিমকুমার বললেন, এ-লাইনের ট্রেনে প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে, রাত্তিরবেলা সাবধানে থাকতে হবে।

সন্তু বলল, ট্রেনে ডাকাতির কথা খবরের কাগজে মাঝে-মাঝে পড়ি। আমরা যতবার ট্রেনে চেপেছি, কখনও দেখিনি।

জোজো বলল, বাঃ, আরাকু ভ্যালি যাওয়ার সময় কী হয়েছিল মনে নেই?

সন্তু বলল, সে তো অন্য ব্যাপার। ডাকাতরা কি মানুষ ধরে নিয়ে যায় নাকি?

জোজো বলল, একবার বাবার সঙ্গে রাজস্থানে যাচ্ছিলাম, ট্রেনটার নাম প্যালেস অন হুই, গোটা দশেক দুর্দান্ত ডাকাত ঘোড়া ছুটিয়ে ট্রেনটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে-যেতে গুলি ছুড়তে লাগল ...

ডালিমকুমার চোখ বড় বড় করে গল্পটা শুনে বললেন, ঠিক সিনেমার মতন।

তারপর বললেন, যদি সত্যি ডাকাত পড়ে, তা হলে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কোরো না ভাই। ঘড়ি, টাকা-পয়সা যা আছে দিয়ে দেওয়াই ভাল। নইলে প্রাণটা যাবে। এরা বড় নিষ্ঠুর, পট করে পেটে ছোরা বসিয়ে দেয়! আমার হাতে যে পাঁচটা আংটি দেখছ, এর একটাও সোনার নয়, সব গিল্টি করা। পকেটে থাকে মোটে একশো টাকা।

কাকাবাবু বললেন, দরজা ভাল করে লক করে দিলেই তো হয়। তা হলে আর ডাকাত ঢুকবে কী করে!

ডালিমকুমার তক্ষুনি উঠে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কিন্তু খানিক বাদেই কে যেন দরজায় ধাক্কা দিল বাইরে থেকে।

ডালিমকুমার ভয়-ভয় চোখে বললেন, খুলব?

কাকাবাবু বললেন, মোটে তো আটটা বাজে। দেখুন বোধ হয় আপনারই। দলের লোক। তা ছাড়া খাবার দিতেও তো আসবে।

ডালিমকুমার জিজ্ঞেস করলেন, কে? বাইরে থেকে উত্তর এল, খুলুন, টিকিট চেকার!

এবার ডালিমকুমার উঠে গিয়ে দরজাটা খুলতেই তাঁকে ধাক্কা দিয়ে একজন ভেতরে ঢুকে এল। পঁচিশ-তিরিশ বছর বয়েস হবে, খাকি প্যান্ট আর শার্ট পরা, মুখে একটা রুমাল বাঁধা। এক হাতে পাইপগান, অন্য হাতে একটা চটের থলে।

ঘ্যাড়ঘেড়ে গলায় সে বলল, সব চুপ! ট্যাঁ-ফোঁ করলে জানে মেরে দেব, কার কাছে টাকাকড়ি কী আছে ছাড়ো। ঘড়ি, টাকা-পয়সা সব এই থলিতে দাও!

ডালিমকুমার সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, দিচ্ছি! দিচ্ছি!

বাঙ্কের ওপর থেকে কাকাবাবু বললেন, আরে, সত্যি-সত্যি ডাকাত এসে গেল। ও মশাই, আপনার কথা মিলে গেল যে!

ডাকাতটি পাইপগানটা কাকাবাবুর দিকে উঁচিয়ে বলল, অ্যাই বুড়ো, চুপ করে থাক। নো স্পিকিং। মানিব্যাগ বার কর, চটপট, চটপট।

কাকাবাবু বললেন, আমার কাছে তো টাকা রাখি না। ওই ছেলেটির কাছে আছে। কী রে সন্তু, টাকা-পয়সা সব দিয়ে দিবি নাকি?

সন্তু বিরক্ত মুখ করে বলল, তা হলে তো আবার সুটকেস খুলতে হবে।

ডাকাতটি জোজো আর ডালিমকুমারের দিকে ঘুরে তাকাল। ডাকাতরা বড়দের সঙ্গেও তুই-তুই করে কথা বলে। সে ডালিমকুমারকে বলল, আংটিগুলো খোল, টাকা বার কর।

জোজো শুকনো মুখে বলল, আমার কাছে একটা ডট পেন ছাড়া কিছু নেই!

ডালিমকুমার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে ছুড়ে দিলেন ডাকাতের থলির মধ্যে, তারপর আংটিগুলো খুলতে লাগলেন।

সন্তু নিচু হয়ে সিটের তলা থেকে সুটকেসটা বার করছে, ডাকাতটা তার পেছনে এক লাথি কষিয়ে দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলল, দেরি করছিস কেন?

স্প্রিংয়ের মতন পেছন দিকে ঘুরে সন্তু ডাকাতটার পা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। সে দড়াম করে পড়ে একদিকের সিটে। সঙ্গে সঙ্গেই উঠে সে পাইপগানটা তোলার চেষ্টা

করল সন্তুর দিকে। সন্তু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, সে প্রায় শূন্যে লাফিয়ে উঠে একপায়ে লাথি কষাল ডাকাতটির গলায়।

সন্তু এখন ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গো। সে আকাশে উড়তে পারে। মনে-মনে বলছে, বিলিবিলি খান্ডা গুলু!

ডাকাতটির হাত থেকে পাইপগানটা খসে গেছে, সন্তু তাকে ঠেসে ধরেছে একদিকের দেওয়ালে।

আর একটি ডাকাত মস্তবড় একটা ছোরা নিয়ে ঢুকে পড়ল। সে এমনভাবে তেড়ে গেল, যেন ছোরাটা এক্ষুনি বসিয়ে দেবে সন্তুর পিঠে।

কাকাবাবু ওপরের বাঙ্ক থেকে একটা ক্রাচ দিয়ে বেশ জোরে মারলেন দ্বিতীয় ডাকাতটির ঘাড়ে। সে আর্ত শব্দ করে বসে পড়ল মেঝেতে।

কাকাবাবু উৎফুল্লভাবে বললেন, আর আছে নাকি? আমাকে নামতে হবে?

পাশের কিউবিল-এ চ্যাঁচামেচি শোনা যাচ্ছে, সেখানেও ডাকাত পড়েছে। জোজো এবার লাফিয়ে গিয়ে চেনটা ধরে ঝুলে পড়ে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগল, ডাকাত, ডাকাত!

সন্তু প্রথম ডাকাতটির হাত থেকে পাইপগান কেড়ে নিয়েছে। দ্বিতীয় ডাকাতটির হাতে ছোরাটা এখনও আছে। সে আবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, এই যে দেখে নাও, আমার হাতে এটা কী রয়েছে।

কাকাবাবুর রিভলভারটা ঠিক তার কপালের দিকে তাক করা।

সে একলাফে চলে গেল দরজার বাইরে। ট্রেনটা ছুটছে অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়ে, চেন টানার জন্য তার গতি কমে এল।

অন্য ডাকাতটা টপাটপ লাফিয়ে পড়ে পালালেও সন্তু যাকে ধরে আছে, সে পালাতে পারল না। সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, এখন কী করব, একে ছেড়ে দেব?

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, না, ধরে থাক, ওকে পুলিশে দিতে হবে। এই বেকার ছেলেগুলো মনে করে একটা পাইপগান আর দু-একটা ছোরাছুরি জোটালেই রেলের নিরীহ যাত্রীদের টাকা-পয়সা লুট করা যায়। এদের ধরে আচ্ছা করে মার দেওয়া দরকার। তারপর কিছুদিন জেলের ঘানি ঘোরালে উচিত শিক্ষা হবে!

তারপর মুচকি হেসে বললেন, ওহে, তোমাকে যদি আমি একটা চাকরি দিই, তা হলে সৎপথে থাকবে?

ছেলেটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, সার, আমাকে পুলিশের হাতে দেবেন না। আপনি নিজে শাস্তি দিন। আপনি যে কাজ দেবেন, তা-ই করতে রাজি আছি।

কাকাবাবু বললেন, হু-উ-উ! অমনই অন্যরকম সুর বেরিয়েছে। আগে আমাকে বলেছিলে বুড়ো, তুই, আর এখন বলছ সার, আপনি! ধরা পড়লেই দয়াভিক্ষা। কিন্তু নিজেরা কাউকে দয়া করো না!

ট্রেনটা থেমে গেছে, শোনা যাচ্ছে হুইলের শব্দ, কারা যেন ছুটে আসছে এদিকে।

ডাকাতটি হাতজোড় করে বলল, বাঁচান সার, মা কালীর দিব্যি করে বলছি, আর কক্ষনও একাজ করব না। আপনি যদি চাকরি দেন, আপনার পায়ে পড়ে থাকব

কাকাবাবু বললেন, চটপট সিটের তলায় শুয়ে পড়ো। সাবধান, পুলিশ যেন টের না পায়। সন্তু, ওর পাইপগানটা জানলা দিয়ে ফেলে দে!

৪. পুলিশের বুটের আওয়াজ

একটু পরেই সমস্ত বগি জুড়ে শোনা গেল পুলিশের বুটের আওয়াজ। গার্ডসাহেব হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। অনেক যাত্রী একসঙ্গে উত্তেজিতভাবে ডাকাতদের বিবরণ দিতে লাগল, কারও কথাই ঠিকমতন বোঝা যায় না।

দুজন পুলিশ যখন এই কিউবিল-এ উঁকি মারল, কাকাবাবু তখন ঘুমের ভান করে রয়েছেন, সন্তু আর জোজো বই খুলে বসে আছে, ডালিমকুমার আংটিগুলো আবার আঙুলে পরে ফেলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখছেন।

পুলিশরা জিজ্ঞেস করল, আপনাদের কিছু খোয়া গেছে?

জোজো আর ডালিমকুমার বলে উঠলেন, না, না কিচ্ছু না!

পুলিশরা আবার জিজ্ঞেস করল, আপনাদের এখানে কেউ ঢোকেনি?

জোজো বলল, কেউ না। আমরা কিছু টের পাইনি। বাইরে চেঁচামেচি শুনেছি। কী হয়েছিল বলুন তো?

উত্তর না দিয়ে পুলিশরা চলে গেল। একজনকেও ধরতে পারেনি বলে তারা বেশ নিরাশ হয়েছে। ডাকাত ধরতে পারলে পুলিশদের বেশ লাভ হয়।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার চলতে শুরু করল ট্রেন। কাকাবাবু উঠে বসে বললেন, যাক বাঁচা গেল, আমাকে মিথ্যে কথা বলতে হল না। সন্তু, এবার দরজা বন্ধ করে দে, আর ছেলেটাকে বেরিয়ে আসতে বল। ওখানে ওর দমবন্ধ হয়ে যাবে।

ডাকাত ছেলেটি মুখের রুমালটা খুলে ফেলেছে, এখন আর তাকে ডাকাত মনে হয় না, মনে হয় সাধারণ একটি যুবক। তেমন লম্বা-চওড়া নয়, দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথার চুল অবশ্য খুব বড়-বড়। থুতনিতে একটা কাটা দাগ। সন্তুদের পাশে সে বসল।

ডালিমকুমার বললেন, রায়চৌধুরীবাবু, আপনার এই ভাইপোটি তো খুব সাঙ্ঘাতিক ছেলে। জুডো ক্যারাটে-ফ্যারাটে সব জানে। জাপানিদের কাছে শিখেছে নাকি?

কাকাবাবু বললেন, না, নিজে নিজেই শিখেছে। বইটই পড়ে প্র্যাকটিস করেছে। ওর ভরসাতেই তো আমি বাইরে বেরোই!

জোজো বলল, আর আমি কীরকম চেন টেনে দিলাম! পুলিশ ডাকলাম!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, জোজোর কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হবে। এ তো সামান্য ছিচকে ডাকাত, জোজো অনেকবার অনেক বড় বড় বিপদ থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আচ্ছা ডালিমবাবু, আপনাদের যাত্রায় তো অনেক মারামারির দৃশ্য থাকে। হিরো হিসেবে আপনাকে ফাইট করতে হয়। আপনি তলোয়ার খেলা, ঘুসোঘুসি, বন্দুক চালানো এসব জানেন?

ডালিমকুমার লাজুকভাবে হেসে বললেন, অত কী আর জানতে হয়! পেছন থেকে বাজনা আর আলো দিয়ে ম্যানেজ করে দেয়।

কাকাবাবু বললেন, ইংরিজি সিনেমায় যারা পার্ট করে, তারা কিন্তু ওসব শিখে নেয়।

ডাকাত ছেলেটির দিকে চেয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ও হে, তোমার নাম কী?

ছেলেটি বলল, অংশুমালী দাস। ডাকনাম হেবো। কাকাবাবু বললেন, খবরের কাগজে যত ছোটখাটো চোর-ডাকাতদের নাম দেখি, সব এইরকম, হেবো, কেলো, ল্যাংচা, ভোঁদড়, পচা—সবার এইরকম বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি নাম হয় কেন?

ডালিমকুমার বললেন, ঠিক বলেছেন।

কাকাবাবু বললেন, কিংবা এইরকম বিচ্ছিরি নাম বাপ-মা দেয় বলেই কি এরা চোর-ডাকাত হয়? অংশুমালী তো সুন্দর নাম, তার ডাকনাম হেবো কেন হবে? ওহে অংশু, পুলিশ তো চলে গেছে, তুমি এবার পালাবার চেষ্টা করবে?

অংশু বলল, আজ্ঞে না সার, আপনি যা বলেন তাই শুনব!

কাকাবাবু বললেন, তুমি কি একটা পাইপগান সম্বল করেই ডাকাতি করতে বেরিয়েছ? আমার ভাইপো সন্তু তোমার চেয়ে বয়েসে কত ছোট, তার সঙ্গে গায়ের জোরে পারলে না? কুস্তি-জুডো কিছু শেখোনি?

অংশু বলল, ওসব কথা আর বলবেন না সার। এই কান মুলে বলছি, আজ থেকে ও-লাইন ছেড়ে দিচ্ছি একেবারে!

কাকাবাবু বললেন, এর মধ্যেই ভাল ছেলে! দেশের কী অবস্থা, চোর-ডাকাতরাও শারীরচর্চা করে না! তোমার বাড়িতে কে-কে আছেন?

অংশু সংক্ষেপে তার জীবনকাহিনী জানাল।

সে একজন ছুতোর মিস্তিরির ছেলে। মা সবসময় অসুস্থ থাকে, বাড়িতে সাতটি ভাইবোন। অভাবের সংসার। সে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ে স্কুল ছেড়ে দিয়েছে। কোনও চাকরি পায়নি। বাড়ির কাছেই একটা বস্তির কিছু ছেলে তাকে ডাকাতির লাইনে নিয়ে এসেছে। এর আগে দুবার ট্রেন-ডাকাতি করেছে, ধরা পড়েনি।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, তা হলে তো তোমাকে ঠিক বেকার বলা যায় না। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছ, কে চাকরি দেবে? ছুতোর মিস্তিরির ছেলে, তুমি বাবার কাছ থেকে কাজ শেখোনি কেন? কাঠের কাজের খুব ডিমান্ড, অনেক পয়সা রোজগার করা যায়। কেন সে কাজ শেখোনি?

অংশু কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ভাল লাগেনি সার।

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, আসলে তুমি একটা বখা ছেলে। বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়েছিলে। ভেবেছিলে ডাকাতি করাটাই সহজ। কম পরিশ্রমে বেশি টাকা। ধরা পড়লে পুলিশ মারতে-মারতে হাত-পা ভেঙে দেয় না? এই সন্তুই তোমার একখানা হাত ভেঙে দিতে পারত। ওই পাইপগান দিয়ে কখনও কোনও লোককে গুলি করেছ?

অংশু দাঁড়িয়ে উঠে কাকাবাবুর পা ছুঁতে গিয়ে বলল, না সার, কখনও মানুষ মারিনি, বিশ্বাস করুন, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।

কাকাবাবু আবার ধমক দিয়ে বললেন, পা ছুঁতে হবে না, বলল! তোমাকে আমি একটা চাকরি দিয়ে পরীক্ষা করে দেখব, তুমি ঠিক পথে থাকতে পারো কি না। আপাতত তোমাকে আমাদের সঙ্গে অনেকদূরে যেতে হবে। রাত্তিরে যখন আমরা ঘুমোব, তখন পালাবার চেষ্টা কোরো না, কোনও লাভ হবে না।

জোজো বলল, পালাতে গেলেই ওর একখানা হাত ভেঙে দেওয়া হবে। আমার ঘুম একবারে কুয়াশার মতন পাতলা।

কাকাবাবু বললেন, ডালিমবাবু, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন। একই। রাতে একই ট্রেনে পরপর দুবার ডাকাত পড়ার কোনও বিশ্বরেকর্ড নেই!

ডালিমবাবু তবু অংশুর দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বললেন, তবু একে। এতটা বিশ্বাস করা কি ঠিক হবে? যদি ঘুমের মধ্যে গলা টিপে ধরে? কথায় আছে, কয়লাকে একশোবার ধুলেও তার কালো রং যায় না।

কাকাবাবু বললেন, ও সত্যিই কয়লা, না ধুলো-ময়লা-মাখা এমনিই একটা পাথর, সেটা আগে জানা দরকার।

বাকি পথটায় আর তেমন কিছু ঘটল না। সন্তু আর জোজো ভাগাভাগি করে রইল নীচের বার্থে, ওপরের একটা বার্থ ছেড়ে দেওয়া হল অংশুকে। টিকিট চেকার আসার পর অংশুর জন্য একটা টিকিট কাটা হল, চারজনের রাত্তিরের খাবার ভাগাভাগি করে খেল পাঁচজন। এমনকী অংশু একবার একলা বাথরুমে গেল, ফিরেও এল।

জব্বলপুর থেকে গাড়ি বদল করে সাতনা যেতে হবে। ডালিমকুমাররা সদলবলে থেকে গেলেন সেখানে। বিদায় নেওয়ার সময় ডালিমকুমার বারবার কাকাবাবু ও সন্তু-জোজোকে বলে গেলেন একবার তাঁদের যাত্রা দেখতে যাওয়ার জন্য। কাকাবাবু বললেন, নিশ্চয়ই যাব, অনেকদিন যাত্রা দেখিনি।

সাতনা স্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন কামালসাহেব। নরেন্দ্র ভার্মার কাছ থেকে তিনি টেলিগ্রাম পেয়েছিলেন। তিনি দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন।

কাকাবাবু তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, কামাল আতাতুর্ক, কতদিন পর দেখা হল! আমিও এদিকে আসিনি এর মধ্যে, তুমিও কলকাতায় যাওনি।

কামাল বললেন, আমি দুবার গিয়েছিলাম কলকাতায়। আপনার খোঁজ করেছি, দুবারই আপনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন।

কাকাবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, এই আমার ভাইপো সন্তু, ওর বন্ধু জোজো। আর অংশু নামে এই ছেলেটি আমাদের পথের সঙ্গী।

কামালসাহেবের চেহারাটি দেখবার মতন। ছ ফুটের বেশি লম্বা, বুকখানা যেন শক্ত পাথরের তৈরি, গায়ের রং বেশ ফরসা। হঠাৎ দেখলে বাঙালি বলে মনেই হয় না। অতবড় শরীর হলেও চোখ দুটি খুব কোমল।

তাঁর ডান দিকের ভুরুর ওপর একটা গভীর কাটা দাগ। ভুরুর খানিকটা উঠেই গেছে। সেদিকে তাকিয়ে খানিকটা অবাক হয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চোখের ওপরে ওটা কী হয়েছে? আগে তো দেখিনি।

কামাল বললেন, ও একটা ব্যাপার হয়েছে কিছুদিন আগে। আপনাকে পরে বলব।

সবাইকে বাইরে এনে একটা স্টেশান-ওয়াগনে তুললেন কামালসাহেব। নিজেই সেটা চালাতে-চালাতে বললেন, আমার বাড়িতে অনেক জায়গা আছে, আপনারা সেখানেই থাকতে পারতেন। কিন্তু নরেন্দ্র ভার্মা জানিয়েছেন আপনারা গেস্ট হাউসে থাকতে চান। তাও ঠিক করে রেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, তোমার বাড়িতে গিয়ে তোমার বউয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব, একদিন তার হাতের রান্নাও খাব। তোমার বিয়ের সময় আমি আসতে পারিনি।

কামাল বললেন, আমার দুটি ছেলেমেয়ে, তাদেরও আপনি দেখেননি!

সাতনা শহরটি ছোট হলেও মাঝখানের এলাকাটা বেশ ঘিঞ্জি। অনেক দোকানপাট। গাড়ি, টাঙ্গা, ঠেলাগাড়ি, স্কুটারের যানজট। সেই জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর রাস্তাটা ভারী মনোরম, দুপাশে লম্বা-লম্বা গাছ।

একটা টিলার পাশে অতিথি ভবনটি ঠিক ক্যালেন্ডারের ছবির মতো। সামনে বাগান, ডানপাশে একটা ছোট নদী, কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। এই বাড়িটি ফিকে নীল রঙের দোতলা, দু তলাতেই চওড়া বারান্দা। গেটের দুপাশে দুটি মোটা-মোটা ইউক্যালিপটাস গাছ, সে-গাছের গুঁড়ির রং এমন ফরসা যে, মনে হয় সাহেব গাছ।

কামাল বললেন, এখানেই আপনাদের জন্য রান্নাবান্নার সব ব্যবস্থা আছে। বাইরে যেতে হবে না। অবশ্য যখন ইচ্ছে বেড়াতে যেতে পারেন, সবসময় একটা গাড়ি থাকবে।

একতলার বারান্দায় অনেক বেতের চেয়ার পাতা। কাকাবাবু একটা চেয়ারে বসে পড়ে আরামের নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, আঃ! ভারী ভাল জায়গা। এখানে আমাকে কেউ চেনে না, কেউ বিরক্ত করতে আসবে না। এখানে শুধু গল্প হবে। কামাল, তোমার কাছে আমরা গল্প শুনব।

কামাল লাজুকভাবে হেসে বললেন, আমি কি গল্প জানি!

কাকাবাবু বললেন, আফগানিস্তানের গল্প। এই ছেলেরা শুনতে চেয়েছে। এখন এককাপ করে চা খাওয়াও।

কামাল গলা চড়িয়ে ইউসুফ, ইউসুফ বলে ডাকলেন।

একজন লোক এসে দাঁড়াল, তার মুখে ধপধপে সাদা দাড়ি, চুলও সব সাদা। দেখলে বুড়ো বলে মনে হলেও চেহারাটা বেশ শক্তপোক্ত, টানটান। লুঙ্গির ওপর ফতুয়া পরা।

কামাল বললেন, এই হচ্ছে বিখ্যাত ইউসুফ মিঞা, এর হাতের রান্না খেলে আর ভুলতে পারবেন না। এটা তো কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউস, বড়বড় সব অফিসাররা আসেন। তাঁরা ইউসুফের রান্না খেয়ে অনেক সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন।

ইউসুফকে কাকাবাবু হাত তুলে সেলাম জানালেন।

কামাল হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফ, সাহেবরা তো এসে গেছেন। আজ কী খাওয়াবেন?

ইউসুফ বললেন, মোগলাই না ইংলিশ, কোনটা খাবেন বলুন। বাঙালি রান্না ভাত, মাছের ঝোলও করে দিতে পারি।

কাকাবাবু ছেলেদের দিকে তাকাতেই জোজো বলল, মোগলাই!

ইউসুফ বললেন, তা হলে শাহি কাবাব, মুর্গ মশল্লা, বাদশাহি বিরিয়ানি, রোগন জুস, মটন কোপ্তা।

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, অত না, অত না। কোনও ভেজিটে নেই? আমি কোনও সবজি বা তরকারি ছাড়া খেতে পারি না। এখন একটু চা দিন আমাদের।

কামাল বললেন, আপনাদের যা খেতে ইচ্ছে করে তাই-ই অর্ডার করবেন। নরেন্দ্র ভামা জানিয়েছেন, আপনাদের কোনও খরচ লাগবে না। সব তিনি দেবেন। যতদিন ইচ্ছে থাকবেন।

কাকাবাবু বললেন, এ যে দেখছি তোফা ব্যবস্থা। বহুদিন এরকম ছুটি কাটাইনি। কোনও ভাবনাচিন্তা নেই। কামাল, এখান থেকে পান্না কতদূরে?

কামাল বললেন, বেশিদূর নয়। গাড়িতে নিয়ে যাব একদিন।

কাকাবাবু বললেন, জানিস সন্তু, এখানে পান্না নামে যে জায়গাটা আছে–

কাকাবাবু শেষ করার আগেই সন্তু বলল, পান্নায় হিরের খনি আছে। ভারতের একমাত্র হিরের খনি!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ। সেখানকার মাঠে-মাঠে ঘুরলেও হঠাৎ একটা হিরে পাওয়া যেতে পারে। দ্যাখ যদি তোরা হিরে আবিষ্কার করে ফেলতে পারিস।

জোজো উৎসাহের সঙ্গে বলল, সেখানে কবে যাব?

কাকাবাবু বললেন, আজ বিশ্রাম। আজ কোথাও না।

ইউসুফ একটা ট্রেতে সাজিয়ে পাঁচকাপ চা নিয়ে এলেন। কাকাবাবু একটা কাপ তুলে চুমুক দিয়েই বললেন, এ কী, এ যে দেখছি বাদশাহি চা! শুধু দুধে তৈরি, এলাচ-দারচিনিরও গন্ধ আছে।

কামাল বললেন, আপনাদের জন্য স্পেশ্যাল।

কাকাবাবু বললেন, ইউসুফসাহেব, এতসব বাদশাহি খানাপিনা আমাদের সহ্য হবে না। আমরা সাধারণ মানুষ। আমাকে খুব কম দুধ-চিনি দিয়ে পাতলা চা দেবে। আমি ঘন-ঘন চা-কফি খাই।

কামাল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনারা তা হলে এখন বিশ্রাম নিন। আমি সন্ধের দিকে আসব।

কাকাবাবু বললেন, সেই ভাল, সন্ধের পরই গল্প জমে। আর হ্যাঁ, ভাল কথা। এই অংশু নামের ছেলেটিকে একটা চাকরি দিতে হবে, একটু খোঁজখবর নিয়ো তো!

অংশু চা শেষ করে বাগানে ঘুরছে। কামাল চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু ডাকলেন, অংশু, অংশু!

অংশু সাড়া দিল না।

কাকাবাবু আবার ডাকলেন, ও অংশু, এখানে একবার এসো, একটা কথা শুনে যাও!

অংশু তবু ফিরে তাকাল না। কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, কী ব্যাপার, ও শুনতে পাচ্ছে না?

জোজো বলল, বুঝতে পারছেন না, ওর নাম অংশু নয়। আমাদের কাছে। মিথ্যে নাম বলেছে।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? সন্তু, ওকে ডেকে আন তো।

সন্তু দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, তোমায় অংশু, অংশু বলে ডাকছিলাম, তুমি শুনতে পাওনি?

ছেলেটি বলল, আপনি যেন কাকে ডাকছিলেন, আমি বুঝতে পারিনি যে আমাকেই ...

হঠাৎ সে থেমে গেল। কেমন যেন করুণ হয়ে গেল মুখের চেহারা। তারপরে আস্তে-আস্তে বলল, অনেকদিন আমায় কেউ ওই নামে ডাকেনি, সবাই হেবো-হেবো বলে, আমি নিজেই ভুলে গিয়েছিলাম।

কাকাবাবু বললেন, তোমায় কেউ ভাল নামে ডাকে না?

অংশু বলল, না সার। পুলিশের লোকও আমাকে ওই নামেই জানে।

কাকাবাবু বললেন, একটা ভাল নাম যখন রয়েছে, তখন কেউ সে-নামে ডাকবে না, এ ভারী অন্যায়। এখন থেকে তুমি আর হেবো নও, এখানে তোমার ও-নাম কেউ জানে না। এখন থেকে তুমি অংশু। নিজের মনে-মনে বারবার বলবে, আমি অংশু, আমি অংশু। আমার নতুন জীবন শুরু হচ্ছে।

অংশু মাথা চুলকে বলল, সার, আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছিলেন।

কাকাবাবু বললেন, ওসব কথা পরে হবে। তোমার পুরো নাম অংশুমালী। এ-নামের মানে জানো?

অংশু কাঁচুমাচু ভাবে বলল, আগে জানতাম বোধ হয়। এখন ভুলে গেছি!

কাকাবাবু বললেন, কী কাণ্ড, একজন মানুষ নিজের নামের মানেই জানে!

কাকাবাবু জোজো আর সন্তুর মুখের দিকে তাকালেন। জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, অংশু মানে চাঁদ।

কাকাবাবু হেসে বললেন, আন্দাজে ঢিল মেরেছ। হয়নি কিন্তু। অংশু মানে কিরণ বা রশ্মি। অংশুমালী মানে যার কিরণ বা রশ্মি আছে। চাঁদের কি নিজস্ব রশ্মি বা আলো আছে? সূর্যের আলো চাঁদের পাথরে গিয়ে ঠিকরে পড়ে,

তাই আমরা চাঁদের আলো দেখি।

সন্তু বলল, অংশুমালী মানে সূর্য। জ্যোতির্ময়।

কাকাবাবু বললেন, ওহে অংশু, আর যেন ভুলে যেয়ো না। তুমি হেবো নও, তুমি অংশুমালী, তোমার নামের মানে সূর্য। আচ্ছা অংশু, তুমি কখনও কবিতা লিখেছ?

অংশু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, কী বললেন সার?

জোজো হো-হো করে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাসলে কেন জোজো?

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনি মাঝে-মাঝে এমন সব অদ্ভুত কথা বলেন! যে ট্রেনে ডাকাতি করত, সে কবিতা লিখবে? কবিরা কখনও ডাকাত হয়?

কাকাবাবু বললেন, কবিরা ডাকাত হয় না বটে, কিন্তু কোনও ডাকাত যদি ডাকাতি ছেড়ে দেয়, তা হলে সে কবি হতে পারে। কী, পারে না? আমাদের দেশে একজন ডাকাত মহাকবি হননি?

সন্তু কিছু বলতে যেতেই জোজো তার মুখ চেপে ধরে বলল, এই, তুই সব বলবি কেন রে? এটা আমি জানি। রত্নাকর থেকে বাল্মীকি!

কাকাবাবু বললেন, তবে? শোনো অংশু, তোমাকে চাকরির জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি যখন কথা দিয়েছি, এখানেই তোমার একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

অংশু ফ্যাকাসে মুখে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, এখানে? না, না সার, এতদূরে আমি চাকরি করতে পারব না!

কাকাবাবু বললেন, কেন পারবে না? পঞ্জাবিরা পঞ্জাব থেকে কলকাতায় এসে কতরকম কাজ করে। উত্তরবঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে দেখবে একজন মাড়োয়ারি দোকান খুলে বসে আছে। গুজরাতিরা আফ্রিকায় ব্যবসা করতে যায়। আর বাঙালিরা ঘরকুনো হয়ে বসে থাকবে? এই দ্যাখো না, কামালও

তো বাঙালি, সে এখানে থেকে গেছে।

অংশু বলল, আমি পারব না। আমার অসুবিধে আছে। বাড়িতে ছোট-ছোট ভাইবোন, তাদের টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করি

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ট্রেনে ডাকাতি করে তাদের টাকা দিয়েছ?

অংশু বলল, হ্যাঁ, দিয়েছি।

কাকাবাবুর মুখ এবার কৌতুকের হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন, এ যে দেখছি সত্যিই রত্নাকর! তুমি ভাইবোনদের কিংবা বাবা-মাকে বলেছ যে ডাকাতি করে টাকা রোজগার করো?

অংশু সবেগে দুদিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, যদি বলতে, দেখতে, ওরা তোমাকে ঘেন্না করত! যাই হোক, তোমাকে এখানেই চাকরি করতে হবে। যদি না চাও, তা হলে তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেব। কোনটা চাও, বেছে নাও।

অংশু চুপ করে রইল।

কাকাবাবু আবার বললেন, তার আগে কিছুদিন তোমাকে পরীক্ষা করা দরকার। তোমার স্বভাব শুধরেছে কিনা সেটা জানতে হবে তো! সেইজন্য এক কাজ করো, তুমি কবিতা লিখতে শুরু করো।

অংশু এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে দু হাত নেড়ে বলতে লাগল, পারব না সার। পারব না। কবিতা কাকে বলে আমি জানিই না!

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, আলবাৎ তোমাকে পারতেই হবে। ক্লাস সিক্স পর্যন্ত যখন পড়েছ, তখন কবিতা পড়োনি? শোনো, তোমাকে আমি একটা লাইন বলে দিচ্ছি। তুমি পরের লাইনটি মিলিয়ে লিখবে। বনের ধারে কেউ ডেকেছে, নাচছে দুটো উল্লুক, এর পরের লাইনটা তুমি ভাবো।

জোজো বলল, উল্লুকের সঙ্গে মেলাতে হবে। বেশ শক্ত আছে।

কাকাবাবু জোজোকে বললেন, এই, তোমরা কেউ কিছু বলবে না। ওকে সাহায্য করবে না। অংশু, তোমাকে আমি তিনদিন সময় দিলাম!

৫. বারান্দায় বসে শুরু হল গল্প

সন্ধের পর ওপরের বারান্দায় বসে শুরু হল গল্প।

চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। দুপুরে গরম ছিল, এখন শিরশিরে ভাব। এখানেও রয়েছে কতকগুলো বেতের চেয়ার। বাংলোটি সুন্দরভাবে সাজানো, কোনও কিছুরই অভাব নেই। কোল ইন্ডিয়ার অতিথি ছাড়া বাইরের লোকদের থাকতেই দেওয়া হয় না।

কাকাবাবু প্রথমে বললেন, সন্তু আর জোজো আমার কী করে পা খোঁড়া হল, সেই ঘটনাটা শুনতে চেয়েছে। খুবই রোমহর্ষক ব্যাপার হয়েছিল। আমি সবটা নিজের মুখে বললে, হয়তো ওদের বিশ্বাস হত না। তাই কামাল আর আমি দুজনে মিলে বলব। আমরা দুজনে সেখানে একসঙ্গে ছিলাম।

কামাল বললেন, নরেন্দ্র ভার্মাও কিছুদিন ছিলেন, তারপর চলে এসেছিলেন।

কাকাবাবু বললেন, আমরা তখন কাজ করতাম ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগে। সরকার থেকে আমাদের আফগানিস্তানে পাঠানো হয়েছিল। কেন পাঠানো হয়েছিল, সেটা আগে বলব না। তার আগে একটু জিজ্ঞেস করে নিই, তোরা আফগানিস্তান সম্পর্কে কতটা জানিস। জোজো, তুমি তো তোমার বাবার সঙ্গে অনেক জায়গায় গিয়েছ, আফগানিস্তানেও গিয়েছিলে কখনও?

জোজো বলল, না। আমার বাবা ঘুরে এসেছেন, সেবার একটুর জন্য আমার যাওয়া হল না!

সন্তু বলল, রবীন্দ্রনাথ কাবুলিওয়ালা নামে একটা গল্প লিখেছেন, আমি সেটা পড়েছি।

কামাল বললেন, আহা, কী চমৎকার গল্প। কলকাতায় এক সময়ে অনেক কাবুলিওয়ালা দেখা যেত, এখনও কিছু কিছু আছে। হিং, কিশমিশ, পেস্তাবাদাম বিক্রি করত।

কাকাবাবু বললেন, কামাল, আমরা একটা জায়গায় পেস্তা বাদাম গাছের প্রায় একটা বন দেখেছিলাম, মনে আছে? কামাল বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে।

জোজো বলল, গোড়া থেকে বলুন। আপনারা কী করে গেলেন ও-দেশে?

কাকাবাবু বললেন, পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যাইনি। প্লেনে গিয়ে কাবুলে নেমেছিলাম। তখন অমৃতসর থেকে কাবুল পর্যন্ত প্লেন সার্ভিস ছিল। এখন আছে কি না জানি না। কাবুলে অবশ্য দু-একদিনের বেশি থাকিনি। তোরা আমুদরিয়া কাকে বলে জানিস?

সন্তু বলল, ভূগোলে পড়েছি। আমুদরিয়া আফগানিস্তানের একটা নদীর নাম।

কাকাবাবু বললেন, সেই নদীর ধার দিয়ে শুরু হয়েছিল আমাদের যাত্রা।

কামাল বললেন, তখন তোমাদের এই কাকাবাবুর কী দারুণ স্বাস্থ্য ছিল। ঝকঝকে চেহারা। যেমন ঘোড়া ছোটাতে পারতেন, তেমনই বন্দুক-পিস্তল চালানো, এমনকী তলোয়ার খেলাতেও ওস্তাদ ছিলেন। রাজাসাহেব, আপনার মনে আছে, একবার আপনাকে তলোয়ার লড়তে হয়েছিল?

কাকাবাবু হেসে বললেন, হ্যাঁ, খুব জোর বেঁচে গেছি। সেই লোকটির নাম ছিল জাভেদ দুরানি। আমাদের ইন্ডিয়ার ক্রিকেট টিমে একসময় সেলিম দুরানি নামে একজন খেলোয়াড় ছিল জানিস? সেও আসলে ছিল কাবুলি। আফগানিস্তানে অনেক দুরানি আছে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, তার সঙ্গে আপনার তলোয়ার লড়তে হয়েছিল কেন?

কাকাবাবু বললেন, সে যে আমাকে চ্যালেঞ্জ করেছিল!

কামাল বললেন, রাজাসাহেব, আগেই ওটা বলে দিলে জমবে না। তার আগে একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হয়েছিল।

কাকাবাবু বললেন, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাবুল থেকেই শুরু করা যাক। আমরা কাবুলে ছিলাম পাঁচদিন, সরকারি লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হল। আমাদের অভিযানের জন্য অনুমতি নেওয়ার দরকার ছিল। আগেই চিঠিপত্রে সব জানানো হয়েছিল অবশ্য। তবু একটা শর্তে আটকে গেল।

কামাল বললেন, সেই সময় নরেন্দ্র ভার্মা চলে এলেন দিল্লি থেকে। উনি কাজ করতেন হোম ডিপার্টমেন্টে। ওঁর অনেক ক্ষমতা। তা ছাড়া নরেন্দ্র ভার্মা তুখোড় লোক, অচেনা মানুষের সঙ্গে নিমেষে ভাব জমিয়ে ফেলতে পারেন। কাবুলের যে দুজন সরকারি অফিসার শর্তের খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের যাওয়া আটকে দিয়েছিলেন, সেই দুজনকে নরেন্দ্র ভার্মা একদিন রাত্তিরে খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন ভারতীয় দূতাবাসে। আমাকে আগের দিন বললেন, ওদের শুধু পেটভরে নয়, প্রাণভরে খাওয়াতে হবে। এমন রান্না হবে, যা ওরা জীবনে খায়নি। কামাল, তুমি হরিণের দুধ জোগাড় করতে পারবে? আর কচি ভেড়ার মাংস। সেই ভেড়ার বয়েস এক মাসের বেশি হলে চলবে না।

কাকাবাবু বললেন, কামালকে তুমি যা বলবে, ও ঠিক জোগাড় করে আনবে।

কামাল বললেন, কচি ভেড়ার মাংস জোগাড় করা শক্ত কিছু নয়। ওখানকার গ্রামের দিকে অনেকেই ভেড়া চরায়। বেশি দাম দিয়ে একটা বাচ্চা ভেড়া কিনে ফেললাম। কিন্তু হরিণের দুধ পাই কোথায়? জঙ্গলে গিয়ে তো হরিণ ধরতে পারি না। ধরলেও সেই হরিণের যে দুধ থাকবে, তার কোনও মানে নেই। আমি তখন কাবুল শহরের চিড়িয়াখানায় অনেকক্ষণ ঘুরলাম। সেখানে অনেকরকম হরিণ আছে, সেখানে একটা হরিণীর সদ্য বাচ্চাও হয়েছে দেখা গেল। কিন্তু তার দুধ নেব কী করে? একজন পাহারাদারকে কথাটা বলতেই সে এমন কটমট করে তাকাল, যেন মেরেই ফেলবে। এর পর একটাই উপায় আছে। আমি রাত্তিরবেলা চিড়িয়াখানার পাঁচিল ডিঙিয়ে ঢুকে পড়লাম চুপিচুপি। সঙ্গে নিয়েছিলাম একটা বদনা। টর্চের আলোয় হরিণীটাকেও খুঁজে পেলাম, কিন্তু দুধ দুইতে গেলেই চ্যাঁচাবে। কোনওক্রমে রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেললাম তার মুখ। পেছনের পা দুটোও বাঁধতে

হল। তারপর এক বদনা ভর্তি দুধ দুয়ে নিলাম। ওরই মধ্যে হরিণীটা শিং দিয়ে একবার টু মেরেছিল আমার পেটে। আর একটু হলে পেটটা ফুটো হয়ে যেত!

কাকাবাবু বললেন, আঃ, কী অপূর্ব রান্না হয়েছিল! এখনও জিভে লেগে আছে সেই স্বাদ। জল দেওয়াই হয়নি। শুধু দুধ দিয়ে রান্না করা নরম তুলতুলে মাংস, অসম্ভব ঝাল। তাই খেয়ে অফিসার দুজন যাকে বলে কুপোকাত। পরদিনই অনুমতি পাওয়া গেল।

কামাল বললেন, নরেন্দ্র ভামা আমাদের সঙ্গে গেলেন না, তিনি ফিরে এলেন দিল্লিতে। আমরা দুজনেই শুধু যাব শুনে অনেকে আমাদের নিষেধ করেছিল, ভয় দেখিয়েছিল। ও-পথে খুব ডাকাতের উৎপাত। কিন্তু তখন আমাদের কম বয়েস, বিপদ-টিপদ গ্রাহ্য করি না, বিপদের কথা শুনলে রক্ত আরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, আমাদের দেশে এত জায়গা থাকতে আপনারা আফগানিস্তানে অভিযানে গেলেন কেন?

কাকাবাবু বললেন, তা হলে একটু ইতিহাসের কথা বলতে হয়।

জোজো বলল, এই রে, হিস্ট্রি আমার খুব বোরিং লাগে, বড্ড সাল-তারিখ মুখস্থ রাখতে হয়।

সন্তু বলল, আমার কিন্তু ইতিহাস বেশ ভাল লাগে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, খুব সংক্ষেপে বলব। যাতে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। সাল-তারিখও মনে রাখতে হবে না। আফগানিস্তান দেশটা যদিও পাহাড় আর মরুভূমিতে ভরা, আর বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য দেশটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেইজন্য বারবার বিদেশিরা এই দেশ আক্রমণ করে দখল করে নিয়েছে। গ্রিস থেকে আলেকজান্ডার এসে আফগানিস্তান জয় করে ভারতের দিকে এগিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর গ্রিস সাম্রাজ্য টুকরো-টুকরো হয়ে যায়। ভারতে তখন মৌর্য বংশের রাজারা খুব

ক্ষমতাশালী, তাঁরা আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পাহাড় পর্যন্ত তাঁদের সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। সম্রাট অশোকের সময়ও এ-দেশটা তাঁর অধীনে ছিল। এরপর কুশান নামে এক দুর্ধর্ষ জাত মধ্য এশিয়া থেকে এসে অনেক দেশ জয় করে নেয়। কুশানদের সবচেয়ে বিখ্যাত সম্রাটের নাম কনিষ্ক।

জোজো বলে উঠল, মুণ্ডুকাটা কনিষ্ক!

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ইতিহাসের বইতে তাঁর মুণ্ডু ভাঙা মূর্তির ছবি থাকে শুধু। কিন্তু তাঁর মুণ্ডু কেউ-কেউ দেখেছে। সন্তু, তোর মনে আছে; সেই যে কাশ্মীরে-

সন্তু বলল, বাঃ, মনে থাকবে না? সেবারই তো আমি প্রথম তোমার সঙ্গে গেলাম।

কাকাবাবু বললেন, সে যাই হোক, সম্রাট কনিষ্কের রাজ্য ওদিকে তো অনেকখানি ছিলই, ভারতের মধ্যেও মথুরা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। এর পরের ইতিহাস আর আমাদের জানার দরকার নেই। কনিষ্কের আমলে আফগানিস্তানের অনেক উন্নতি হয়েছিল, তখনকার কিছু কিছু ব্যাপার এখনও অজানা রহস্য রয়ে গেছে। সেইরকমই একটা কিছুর খোঁজে আমাদের যেতে হয়েছিল।

জোজো জিজ্ঞেস করল, একটা কিছু মানে কী?

কাকাবাবু বললেন, সেটা যথাসময়ে জানতে পারবে।

কামাল বললেন, কাবুল থেকে আমরা একটা জিপগাড়িতে পৌঁছে গেলাম ফৈজাবাদ। সেটা খুব ছোট শহর। সেখান থেকে আমাদের ঘোড়া ভাড়া নিতে হল। সঙ্গে অস্ত্র রাখতে হয়েছিল, আমার কাছে একটা রাইফেল, রাজাসাহেবের কাছে একটা রিভলভার।

কাকাবাবু বললেন, কামাল, তুমি আমাকে বারবার রাজাসাহেব, রাজাসাহেব বলছ কেন? শুনলে অন্য কেউ ভাববে, আমি বুঝি সত্যি কোনও রাজা। তুমি তো আগে আমাকে শুধু দাদা বলতে!

কামাল বললেন, ঠিক আছে, দাদাই বলব, দাদার তখন কী সুন্দর চেহারা ছিল, সবাই দেখলেই খাতির করত। আমরা সঙ্গে অনেক খাবারদাবার নিয়েছিলাম, শুকনো ফলই বেশি, আখরোট, পিস্টাশিও, কিশমিশ, খেজুর এইসব। কোথায় কী জুটবে তার ঠিক নেই। পাহাড় আর জঙ্গল, মাঝখান দিয়ে চলেছে আমুদরিয়া নদী, মাইলের পর মাইল কোনও জনবসতি নেই।

জোজো বলল, সেই তলোয়ারের যুদ্ধটা হল কোথায়? কাকাবাবুর সঙ্গে কি তলোয়ারও ছিল?

সন্তু বলল, আঃ জোজো, তোর একদম ধৈর্য নেই। চুপ করে শোন না!

কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা কামাল, সেই বাঘটা আমরা দেখেছিলাম কবে? প্রথম দিনই?

কামাল বললেন, না, দাদা। সেটা তো তৃতীয় দিন। প্রথম দিন শুধু পিঁপড়ে।

কাকাবাবু বললেন, ওরেবাব্বা, সেরকম পিঁপড়ে জীবনে দেখিনি! বাঘের থেকে কম ভয়ঙ্কর নয়। সন্তু, তোর মনে আছে, একবার মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে আমরা পিঁপড়ের পাল্লায় পড়েছিলাম? সে-পিঁপড়েও আফগানিস্তানের পিঁপড়ের তুলনায় কিছুই নয়।

কামাল বললেন, প্রথম দিনটায় কিছুই ঘটেনি। শুধু আমাদের আস্তে-আস্তে এগোতে হচ্ছিল। পাহাড়ি রাস্তায় তো জোরে ঘোড়া ছোটাবার উপায় নেই। সন্ধের সময় আমরা নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে নিলাম বিশ্রামের জন্য।

জোজো জিজ্ঞেস করল, আপনাদের সঙ্গে তাঁবুও ছিল?

কামাল বললেন, ছোট্ট নাইলনের হালকা তাঁবু। শুধু মাথা গোঁজবার জন্য। আফগানিস্তানে শীতকালে খুব শীত, আর গরম কালে খুব গরম। তখন ছিল গরমকাল। কম্বল-টম্বল নিতে হয়নি। বৃষ্টিও হয় খুব কম। পাথর দিয়ে উনুন বানিয়ে আমরা রুটিও সেঁকে নিয়েছিলাম।

রুটি আর খেজুর, চমৎকার খাওয়া হল। একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম। মাঝরাত্তিরে আক্রমণ করল পিঁপড়ে।

কাকাবাবু বললেন, হাজার-হাজার, লক্ষ-লক্ষ পিঁপড়ে। লাল লাল রং, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা, তাদের কামড়ে সাঙ্ঘাতিক বিষ। যন্ত্রণার চোটে আমরা নাচতে শুরু করেছিলাম। শেষপর্যন্ত আমরা ঝাঁপ দিলাম নদীতে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখলাম জলে।

কামাল বলল, দ্বিতীয় রাতে কিন্তু কিছুই হয়নি। পিঁপড়ে-টিপড়ে ছিল না, পরিষ্কার জায়গা। খুব ভাল ঘুমিয়েছিলাম।

অংশু একটু দূরে একেবারে চুপচাপ বসে আছে, একটি কথাও বলেনি। কাকাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী অংশু, শুনছ তো? ভাল লাগছে?

অংশু শুকনো গলায় বলল, হ্যাঁ সার।

জোজো চুপিচুপি সন্তুকে বলল, ও বেচারা কবিতার দ্বিতীয় লাইন ভেবে-ভেবে পাগল হয়ে যাচ্ছে!

কামাল বলল, তৃতীয় দিন দিনের বেলাতেই আমরা বাঘটাকে দেখলাম। আমরা তখন একটা টিলার ওপরে–

সন্তু খানিকটা সন্দেহের সুরে বলল, আফগানিস্তানে বাঘ আছে?

কাকাবাবু বললেন, থাকবার কথা নয়। এককালে এই আমুদরিয়া নদীর ধারে-ধারে এক ধরনের বাঘ ছিল, তাদের বলা হত সাইবেরিয়ান টাইগার। সবাই জানে, তারা সব লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা চোখের সামনে একটাকে দেখলাম। নিশ্চয়ই দুটো-একটা তখনও রয়ে গিয়েছিল। মুখে ঝাঁটার মতন মস্ত গোঁফ, পিঠটা উঁচুমতন। আমরা তখন একটা টিলার চূড়া পেরিয়ে অনেকটা নেমে এসেছি, এই সময় একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল বাঘটা, আমাদের দেখে লেজ আছড়াতে লাগল। আমরা যদিও ওপরের

দিকে আছি, বাঘটা লাফিয়ে আমাদের ধরতে পারবে না। কিন্তু আমাদের পশ্চাদপসরণ করতে হলে পেছন ফিরতেই হবে, তখন যদি ও তেড়ে আসে?

জোজো বলল, আপনাদের সঙ্গে তো রাইফেল ছিল?

কাকাবাবু বললেন, তা ছিল। কিন্তু সাইবেরিয়ান টাইগার দুর্লভ প্রাণী, তাকে মারব? ও আমাদের একবার দেখে ফেলেছে, এদিকে মানুষ খুব কমই যাতায়াত করে, আমাদের দেখে ও লোভ সামলাবে কী করে? শেষপর্যন্ত কামালই একটা ব্যবস্থা করল।

কামাল বললেন, কেন ও-কথা বলছেন দাদা? বাঘটাকে দেখে ভয়ে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। হিংস্রভাবে গরগর শব্দ করতে-করতে ল্যাজ আছড়াতে দেখলেই মনে হয়, এবার আর নিষ্কৃতি নেই। তখন তোমাদের কাকাবাবু আমার হাত থেকে রাইফেলটা নিয়ে বললেন, কামাল, তুমি টিলাটার ওপর দিকে চলে যাও, আমি একে সামলাচ্ছি। উনি পরপর দুটি গুলি করলেন, একটাও বাঘটার গায়ে লাগল না, পাথরের বলটা ছিটকে গেল। বাঘটা অবশ্য একলাফে অদৃশ্য হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। তখন আমি ভেবেছিলাম, রাজা রায়চৌধুরীর হাতে টিপ নেই, নতুন বন্দুক চালাতে শিখেছেন। পরে বুঝেছি, উনি ইচ্ছে করে বাঘটাকে মারেননি।

কাকাবাবু হেসে বললেন, বাঘটা তো আমাদের আক্রমণ করেনি, শুধু ল্যাজ আছড়েছিল। হয়তো বাঘটাও আমাদের দেখে অবাক হয়েছিল। ওর ঠিক কানের কাছে গুলি চালিয়েছিলাম।

জোজো জিজ্ঞেস করল, বাঘটা আর ফিরে আসেনি?

কাকাবাবু বললেন, নাঃ! তার আগেই যে অন্য একটা ঘটনা ঘটল। গুলি না চালিয়েই বাঘটাকে তাড়াবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। পাহাড়ে গুলির শব্দ অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যায়। আমার সেই গুলির শব্দ শুনে চলে এল একটা ডাকাতের দল।

কামাল বললেন, ওরা ছ-সাতজন ছিল। আমরা বাধা দেওয়ার কোনও সুযোগই পেলাম না। প্রত্যেকের হাতে বন্দুক, চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরল আমাদের।

জোজো বলল, এ যে ওয়েস্টার্ন ফিলমের মতন!

বাংলোর সামনে একটা জিপ এসে থামল। তার থেকে দুজন লোক নেমে চিৎকার করল, চৌকিদার? কেয়ারটেকার!

গল্পে বাধা পড়ল। কামালসাহেব উঠে গিয়ে বারান্দার রেলিং-এর কাছে দাঁড়িয়ে নীচে উঁকি মারলেন।

গেটের কাছে একজন চৌকিদার সবসময় থাকে, সে এখন নেই। ওই লোকদের হাঁকডাক শুনে বেরিয়ে এলেন ইউসুফ বাবুর্চি।

একজন লোক তাকে বলল, এখানে ঘর খালি আছে? একটা ঘর খুলে দাও!

ইউসুফ বললেন, এখানে তো রিজার্ভেশান ছাড়া কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না।

লোকটি রুক্ষস্বরে বলল, আমাদের রিজার্ভেশান আছে কি নেই, তা তুমি জানছ কী করে? আগে ঘর খোলো!

ইউসুফ বললেন, ঘর তো খালি নেই। আজই একটি পার্টি এসেছে।

অন্য লোকটি বলল, ঘর খালি নেই? ঠিক আছে, আমরা বারান্দায় বসছি, আমাদের চা করে দাও। আর চটপট রুটি-মাংস বানিয়ে দাও, আমরা নিয়ে যাব।

ইউসুফ বললেন, মাফ করবেন সার। এখানে বাইরের লোকদের খাবার দেওয়ার নিয়ম নেই।

লোকটি দুখানা একশো টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, বেশি কথা বোলো না, এই নাও, যা বলছি করে দাও!

ইউসুফ বললেন, আমি পারব না। আপনারা বরং ডান দিকে এক কিলোমিটার চলে যান, সেখানে হোটেল আছে। খাবারদাবার সব পাবেন।

একজন লোক এবার ইউসুফ মিঞার গলা চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কোথায় আমরা যাব না যাব, তা তোমার কাছে কে শুনতে চেয়েছে? মারব এক থাপ্পড়!

কামাল একবার ওপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, ও কী হচ্ছে, ওকে ছেড়ে দিন।

সন্তু দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

লোক দুটি কামালের কথা গ্রাহ্যই করল না। একজন ইউসুফকে চুলের মুঠি ধরে বলল, আমাদের চিনিস না? মুখে-মুখে কথা! টাকা দেব, খাবার তৈরি করে দিবি।

কাকাবাবুও উঠে এসে রেলিং-এর পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, লোকদুটি তো বড় বেয়াদপ। শুধু-শুধু ইউসুফকে মারছে!

সন্তু ততক্ষণে নীচে পৌঁছে গেছে। ইউসুফের কাছে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে লোক দুটিকে বলল, ওকে ছেড়ে দিন।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু একা পারবে না। কামাল, তুমি নীচে গিয়ে লোক দুটিকে ধরো।

এবার ওদের একজন টর্চের আলো ফেলল দোতলায়।

অন্যজন অস্ফুট স্বরে বলল, ও কে? রাজা রায়চৌধুরী না?

অন্য লোকটি বলল, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।

ইউসুফকে ছেড়ে দিয়ে ওরা দ্রুত ফিরে গেল জিপগাড়িটার দিকে। কামাল নীচে পৌঁছবার আগেই ওরা স্টার্ট দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল!

কামাল বিরক্তভাবে বললেন, চৌকিদার গেল কোথায়? ইউসুফ, তুমি বেরোতে গেলে কেন? বাইরের লোক ডাকাডাকি করলেও তুমি বেরোবে না।

ইউসুফ আস্তে-আস্তে বললেন, এইসব লোক, বেআইনিভাবে পয়সা রোজগার করে, আর সব জায়গায় গায়ের জোর ফলায়।

সন্তু আর কামাল ফিরে এলেন দোতলায়।

জোজো বলল, ওরা কাকাবাবুকে দেখেই ভয়ে পালাল।

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, ব্যাপারটা ভাল হল না রে জোজো। আমি ভেবেছিলাম, এই সাতনার মতন জায়গায় আমাকে কেউ চিনবে না।

কামাল বললেন, সত্যিই তো, চিনল কী করে? এখানে আপনি অনেকদিন আসেননি। এখানে হিরের খনি আছে, অনেকরকম ব্যবসা শুরু হচ্ছে, তাই গুণ্ডা বদমাশদের উৎপাত বাড়ছে। তোক দুটোর ব্যবহার টিপিক্যাল গুণ্ডার মতন।

কাকাবাবু বললেন, অনেকদিন আগে সূর্যপ্রসাদ নামে একটা লোক আমার কাছে জব্দ হয়েছিল। খাজুরাহো মন্দিরের মূর্তি ভেঙে-ভেঙে বিক্রি করা ছিল তার কাজ। ফাঁদে ফেলে তাকে আমি ধরেছিলাম। খুব একটা শাস্তি দিইনি। মূর্তিগুলো সব উদ্ধার করার পর সে আমার সামনে নাকে খত দিয়েছিল, তারপর তাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কামাল বললেন, এই তো আপনার দোষ! আপনার দয়ার শরীর, আপনি ক্ষমা করে দেন। তারা কিন্তু আপনার শত্রুই থেকে যায়।

কাকাবাবু অংশুর দিকে তাকালেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন, না, তা নয়। অনেক সময় ক্ষমা করে দিলে তারা ভাল হয়ে যায়।

কামাল বললেন, ওই সূর্যপ্রসাদ তো কুখ্যাত অপরাধী। চোরাচালান, মানুষ খুন, কিছুই বাকি রাখেনি। পুলিশের হাত থেকে দুবার পালিয়েছে। আপনি ক্ষমা করে দিলেও সে একটুও শোধরায়নি। এখন তার মস্তবড় দল। তবে শুনেছি, তার নিজেরই দলের একজন লোক তার তলপেটে একবার ছুরি মেরেছিল, তাতেও সে বেঁচে গেছে বটে, কিন্তু শরীর ভেঙে গেছে। নিজে আর বেরুতে পারে না। কোনও জায়গায় লুকিয়ে থেকে সে দল চালায়। এ-লোকগুলো সূর্যপ্রসাদের দলের লোক হতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে আর কী করা যাবে? কামাল বললেন, সূরপ্রসাদকে আপনি নাক-খত দিইয়েছিলেন, সেই অপমানের সে শোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে না? যখন সে শুনবে আপনি এখানে এসেছেন ... আমার মনে হচ্ছে দাদা, ওই লোক দুটো দলবল নিয়ে ফিরে আসবে, এখানে হামলা করবে!

কাকাবাবু বললেন, আমি তো আর ওদের ঘাঁটাতে যাচ্ছি না। এখানে আমি গুণ্ডা দমন করতে আসিনি, এসেছি বিশ্রাম নিতে।

কামাল জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললেন, উঁহুঃ, ভাল বুঝছি না। এখানকার চৌকিদার তো দেখছি অপদার্থ। পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। নরেন্দ্র ভামা আমার ওপর আপনাদের দেখাশুনোর দায়িত্ব দিয়েছেন।

জোজো বলল, গল্পটার কী হল? তারপর আফগানিস্তানের গল্পটা বলুন। ডাকাতের দল আপনাদের ঘিরে ধরেছিল–

কামাল বললেন, এখন তো আর গল্প হবে না ভাইটি। আমার এখনই থানায় যাওয়া দরকার। যদি রাত্তিরেই ওরা ফিরে আসে?

কামাল উঠে দাঁড়ালেন।

কাকাবাবু বললেন, ভেবেছিলাম এখানে নিরিবিলিতে শান্তিতে থাকব। তা নয়, এর মধ্যে এসে গেল গুণ্ডা, তার ওপর পুলিশ। গল্পটা মাটি হয়ে গেল। তুমি যাও বঙ্গে, কপাল তোমার সঙ্গে! অভাগা যেদিকে যায়, সাগর শুকায়ে যায়!

৬. সকালবেলা চা খেতে-খেতে

সকালবেলা চা খেতে-খেতে কাকাবাবু অংশুকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে, কবিতা মেলাতে পারলে?

অংশু কাঁচুমাচুভাবে বলল, আমার দ্বারা হবে না সার। আমার সাতপুরুষে কেউ কখনও ওকর্ম করেনি।

কাকাবাবু বললেন, তুমি কী করে জানলে? সাতপুরুষের সকলের কথা জানো? তোমার বাবা ছুতোর মিস্তিরি, ঠাকুদা কী ছিলেন? ঠাকুর্দার বাবা?

অংশু বলল, আমার ঠাকুদাকে আমি কখনও চোখেই দেখিনি। আগে আমাদের মেদিনীপুরের কোনও গ্রামে বাড়ি ছিল, বাবা চলে এসেছিলেন সোদপুরে।

কাকাবাবু বললেন, মেদিনীপুরের গ্রামে তোমার ঠাকুর্দা হয়তো কবিয়াল ছিলেন। অনেক ছুতোর মিস্তিরি, নৌকোর মাঝি, গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান নিজেরা গান বানান। পোস্ট অফিসের এক পিওনের কাছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনেক গান শিখেছিলেন, তা জানো?

অংশু এসব কথায় কান না দিয়ে মুখ গোঁজ করে বলল, তা যাই বলুন সার, কবিতা-ফবিতা আমি পারব না। আপনি আমাকে মাটি কাটতে বলুন, কাঠ কাটতে বলুন, কুয়ো থেকে জল তুলতে বলুন, সব পারব। শুধু কবিতা-ফবিতা, না, অসম্ভব, অসম্ভব!

কাকাবাবু বললেন, ফবিতা জিনিসটা কী আমি জানি না। সেটা আমিও পারব না। কিন্তু একটু মাথা খাটালে সবাই কবিতা মেলাতে পারে। শোনো, তোমাকে ছাড়া হবে না। যতক্ষণ না মেলাতে পারছ, ততক্ষণ চাকরি হবে না। এখান থেকে পালাতেও পারবে না। ভাবো, ভাবো। লাইনটা মনে আছে। তো? বনের ধারে ফেউ ডেকেছে নাচছে দুটো উল্লুক।

অংশু বলল, হ্যাঁ, মনে আছে। ফেউ মানে কী সার?

কাকাবাবু বললেন, শেয়াল। শেয়ালের ডাক।

অংশু বলল, শেয়াল তো হুক্কা-হুয়া করে ডাকে।

কাকাবাবু বললেন, তা ঠিক। সন্ধে হলেই শেয়াল হুক্কা-হুয়া করে ডাকে। কিন্তু কাছাকাছি যদি বাঘ দেখা যায়, অমনি শেয়ালের গলা পালটে যায়। ভয়ের চোটে ডাকে ফেউ-ফেউ।

অংশু জিজ্ঞেস করল, এ-লাইনটা আপনি বানিয়েছেন, না কোনও বই থেকে নিয়েছেন?

কাকাবাবু বললেন, আমি বানিয়েছি। কেন, আমি বানাতে পারি না? তুমিও পারবে।

অংশু উঠে বাগানে চলে গেল।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনি বেচারাকে খুব বিপদে ফেলে দিয়েছেন। কবিতা মেলাতে হবে ভেবে-ভেবে ওর মুখ শুকিয়ে গেছে।

সন্তু বলল, প্রথমবারেই বড্ড শক্ত হয়ে গেল ওর পক্ষে। আর-একটু সোজা দিলে পারতে।

কাকাবাবু বললেন, এমন কিছু শক্ত না!

জোজো বলল, আমি এক মিনিটে মিলিয়ে দিতে পারি। বলব?

কাকাবাবু বললেন, খবদার না। তোমরা কেউ কিছু বলবে না।

সন্তু বলল, কাকাবাবু, অংশু একটা জামা আর প্যান্ট পরে আছে। আমাদের জামা-প্যান্ট ওর লাগবে না, ও বেশি লম্বা। ও কি দিনের পর দিন ওই এক জামা-প্যান্ট পরে থাকবে? গা দিয়ে গন্ধ বেরোবে যে!

কাকাবাবু বললেন, ঠিক বলেছিস। ওকে দুসেট জামা-প্যান্ট-গেঞ্জি কিনে দিতে হবে।

একটু পরে একটি স্টেশান-ওয়াগন এসে গেল। কামালসাহেব নিজে আসেননি, একজন ড্রাইভার সেটা চালাচ্ছে। ড্রাইভারের হাতে একটা চিঠি। কামালসাহেব সবাইকে তাঁর বাড়িতে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে সকলে তৈরি হয়ে নাও। অংশুঁকে ডাকো।

অংশু নিজেই এগিয়ে এসে কাকাবাবুকে বলল, সার, হয়ে গেছে।

যেন একটা কঠিন অঙ্ক দেওয়া হয়েছিল, সে কোনওরকমে করে ফেলেছে। হাসি ফুটেছে মুখে।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? শুনি।

অংশু বলল, জল দিয়ে পতপত করে ভেসে যাচ্ছে একটা শালুক!

সন্তু মুচকি হেসে ফেলল, আর জোজো হেসে উঠল খুব জোরে।

অংশু রেগে গিয়ে বলল, কেন, মেলেনি? ভাল্লুকের সঙ্গে শালুক মেলে না?

কাকাবাবু নিজে হাসি চেপে ওদের দুজনকে ধমক দিয়ে বললেন, এই, তোরা হাসছিস কেন? হাসির কী আছে!

তারপর অংশুঁকে বললেন, না, তোমার হয়নি। প্রথম কথা, আমার লাইনটাতে ভাল্লুক ছিল না, ছিল উল্লুক। উল্লুকের সঙ্গে শালুক ভাল মিল হয় না। দ্বিতীয় কথা, কবিতার একটা ছন্দ থাকে। সেটা বুঝতে হবে আগে। আমি যে লাইনটা বলেছি, তার ছন্দ হবে এইরকম :

বনের ধারে

ফেউ ডেকেছে
নাচছে দুটো
উল্লুক।

তোমাকেও এই ছন্দে বানাতে হবে লাইন।

জোজো পেট চেপে হাসি সামলাতে সামলাতে বলল, জল দিয়ে পতপত করে ভেসে যাচ্ছে একটা শালুক! পতপত করে কিছু ভেসে যায় নাকি? পতপত করে তো পতাকা ওড়ে! আর শালুক ফুল তো ভেসে যায় না, একজায়গায় ফুটে থাকে।

কাকাবাবু বললেন, হয়ে যাবে, হয়ে যাবে, আর-একটু চিন্তা করলেই ঠিক পারবে। চেষ্টা তো করেছ। এবার চলো, যাওয়া যাক।

বাংলোর গেট থেকে খানিকটা দূরে একটা পুলিশের জিপ দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুদের গাড়িটা ছাড়তেই সেটা পেছনে পেছনে আসতে শুরু করল।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে থামাতে বলে পুলিশের গাড়ির ইনস্পেক্টরকে ডেকে বললেন, শুনুন, আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে আসতে হবে না। আমি মন্ত্রীও নই, ভি. আই. পি-ও নই। রাত্তিরবেলা আপনাদের ইচ্ছে হলে পাহারা দেবেন, দিনের বেলা আপনাদের থাকার দরকার নেই।

পুলিশটি বলল, সার, আমাদের ওপর অর্ডার আছে, আপনাকে সর্বক্ষণ চোখে-চোখে রাখতে হবে। এটা আমাদের ডিউটি।

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, আমিই তো বারণ করছি আপনাদের। ওপরওয়ালাকে গিয়ে সেই কথা বলুন। সর্বক্ষণ আমি পুলিশ নিয়ে ঘুরতে পারব না।

পুলিশের গাড়িটা থেমে রইল। এ-গাড়ির ড্রাইভার কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিল কামালসাহেবের বাড়িতে।

হলুদ রঙের বাড়িটা তিনতলা। সামনে লোহার গেট। একতলা, দোতলা, তিনতলার বারান্দা গ্রিল দিয়ে ঘেরা। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মাঝখানেও একটা লোহার দরজা।

একতলায় দুটো দোকান ঘর। সকলে এসে বসল দোতলায়।

কামালসাহেবের স্ত্রীর নাম জুলেখা। ছেলেমেয়ে দুটির নাম অরণ্য আর তিস্তা। ছেলের বয়েস এগারো, মেয়ের বয়েস সাড়ে আট।

কাকাবাবু ওদের আদর করে বললেন, বাঃ, বেশ সুন্দর নাম তো?

কামাল বললেন, ওদের বাংলা নাম রেখেছি। এখানে থেকে থেকে যাতে অবাঙালি না হয়ে যায়, সেইজন্য আমার স্ত্রী রোজ ওদের বাংলা পড়ায়, বাংলা গান শেখায়।

কাকাবাবু বললেন, তোমরা একটা গান শুনিয়ে দেবে না কি?

কামাল বললেন, না, না, দাদা। বাড়িতে কোনও অতিথি এলে ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে তাদের সামনে গান গাওয়ানো কিংবা কবিতা আবৃত্তি করা খুব হাসির ব্যাপার। আরও আসবেন মাঝে-মাঝেই, কোনও এক সময় সবাই মিলে গান গাওয়া হবে।

ছেলেমেয়েদের ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে কামাল জিজ্ঞেস করলেন, কাল রাত্তিরে কোনও উৎপাত হয়নি তো?

কাকাবাবু বললেন, কিচ্ছু না। চমৎকার ঘুমিয়েছি।

কামাল বললেন, এদিকে দুটি অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। কাল আমি যখন থানায় গেলাম, আমাকে কিছু বলতেই হল না। থানার অফিসার বললেন, জব্বলপুর থেকে এক্ষুনি অর্ডার এসেছে, রাজা রায়চৌধুরী কোল ইন্ডিয়ার গেস্ট হাউসে রয়েছেন। সেখানে সর্বক্ষণ পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। আপনি যেখানেই যান, সেখানেই কি পুলিশের পাহারার ব্যবস্থা থাকে?

কাকাবাবু বললেন, কক্ষনও না। অনেক সময় পুলিশরা আমার কথা জানতেই পারে না। শুধু-শুধু আমাকে পাহারা দিতে হবে কেন?

কামাল বললেন, থানার অফিসার কিন্তু বেশ গুরুত্ব দিয়েই বললেন। খুব ওপর মহল থেকে অর্ডার এসেছে মনে হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, এতে তো আমার সম্পর্কে লোকের কৌতূহল বাড়বে। যারা জানত না, তারাও জেনে যাবে।

কামাল বললেন, জানতে কারও বাকি নেই। এই দেখুন, এখানকার ইংরিজি খবরের কাগজ। তাতে আপনার ছবি বেরিয়েছে, খবরে লিখেছে যে, আপনি মধ্যপ্রদেশে কোনও রহস্যের সন্ধানে এসেছেন।

কাকাবাবু অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, সে কী? আমি এত বিখ্যাত হলাম কবে থেকে? তা ছাড়া, এত তাড়াতাড়ি আমার এখানে আসার কথা খবরের কাগজের লোকেরা জানবে কী করে?

সন্তু-জোজোরা ঝুঁকে পড়ে কাগজটা দেখল। প্রথম পাতায় ডান দিকের শেষ কলামে কাকাবাবুর ছবি, সেইসঙ্গে কাকাবাবু সম্পর্কে অনেকটা লেখা।

জোজো বলল, ওই যাত্রার দলের লোকেরা নিশ্চয়ই বলে দিয়েছে।

সন্তু খবরের কাগজটার সবকটা পাতা উলটেপালটে দেখে বলল, কিন্তু ওই যাত্রার দলের কোনও খবর তো বেরোয়নি।

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, তা হলে তো এখানে আর থাকা চলে না। নানারকম লোক এসে দেখা করতে চাইবে! বিরক্ত করবে। এখান থেকে ঝাঁসি চলে গেলে কেমন হয়? সেটাও বেশ ভাল জায়গা। এখানকার গেস্ট হাউসটা খুব পছন্দ হয়েছিল।

জোজো বলল, না, আমরা এখানেই থাকব। কাল রাত্তিরে দারুণ খাইয়েছে!

কামাল বললেন, পুলিশকে বলে দেওয়া হবে, কেউ যেন বাংলোর মধ্যে ঢুকতে না পারে। কয়েকটা দিন অন্তত দেখা যাক।

কামালের স্ত্রী জুলেখা এই সময় টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলেন। পাকা পেঁপে, ডিমসেদ্ধ, পরোটা, আলুর দম, মাংসের কিমা, পাকা খেজুর, ফিরনি, কাঁচাগোল্লা

কাকাবাবু বললেন, ওরে বাবা, এত খাবার?

জোজোর চোখ চকচক করে উঠল, সেও বলল, সত্যিই, এত খাবার দেওয়ার কোনও মানে হয়? তারপরই সে একটা আস্ত ডিমসেদ্ধ মুখে পুরে দিল।

কাকাবাবু বললেন, কাল রাতে ইউসুফ মিঞা আমাদের বিরিয়ানি, কাবাব-কালিয়া কতরকম যে খাইয়েছে! অতি সুস্বাদু বটে! কিন্তু বাঙালির পেটে এত মোগলাই খাবার রোজ-রোজ সহ্য হবে না। একবেলা অন্তত আমার ডাল-ভাত-মাছের ঝোল চাই।

কাকাবাবু সামান্যই খেলেন। সন্তুও তাই। জোজো আর অংশু সবরকমই চেখে দেখল।

চা শেষ করে কাকাবাবু বললেন, জুলেখা, তোমার হাতের চা চমৎকার। মাঝে-মাঝে এসে খাব। চলো কামাল, তোমার বাড়িটা ঘুরে দেখি। মস্ত বড় বাড়ি বানিয়েছ!

জোজোর পায়ে এখন ব্যান্ডেজ নেই, সিঁড়ি দিয়ে দিব্যি তরতর করে উঠে যাচ্ছে। সত্যি তার পা মুচকেছিল, নাকি হেলিকপ্টার থেকে লাফাবার গল্পটা বলার জন্যই ওটা বেঁধেছিল, তা বুঝতে পারল না সন্তু।

সিঁড়িতে প্রত্যেক তলায় কোলাপসিবল গেট, জানলাগুলোয় গ্রিলের সঙ্গে মোটা তারের জাল, ছাদও পুরোটা খুব শক্ত জাল দিয়ে ঘেরা।

কাকাবাবু বললেন, তোমার বাড়িটা দেখছি দুর্গের মতন দুর্ভেদ্য। ছাদটা এমনভাবে ঘেরা কেন? বাঁদর-হনুমানের উৎপাত হয় বুঝি?

কামাল বললেন, নাঃ, এখানে বাঁদর নেই। তবে মানুষের বাঁদরামি খুব বেড়েছে। সন্ধের পর রাস্তাঘাটে ছিনতাই হয়। একদিন আমার বাড়ির ছাদে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা ঠুকঠুক শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। শব্দটা হয়েই চলেছে। আমার বাড়ির নীচে সব দোকানঘর। রাত্তিরে কেউ থাকে না। আমিই একলা পুরুষমানুষ। জুলেখাকে না জাগিয়ে আমি উঠে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। ছাদের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তখনও কেউ ঠুকঠুক শব্দ করছে। আমি দরজাটা খুলে ফেললাম!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি খালি হাতে ছাদে উঠে গেলে?

কামাল বললেন, আমার বন্দুকের লাইসেন্স আছে। রিভলভারও সঙ্গে রাখি। কিন্তু সে-রাত্তিরে ওগুলো নেওয়ার কথা মনে হয়নি। চোর-ডাকাত হলে তো ঠুকঠুক শব্দ করবে না। আমি কোনও জন্তু-জানোয়ারের কথাই ভেবেছিলাম। তাই সঙ্গে একটা লাঠি নিয়েছিলাম। ছাদের দরজাটা খুলে ফেললাম আস্তে-আস্তে। কাউকে দেখা গেল না। অমাবস্যার রাত, ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। তবু আমি ছাদের এদিক-ওদিক ঘুরলাম। হঠাৎ আমার পেছন দিক থেকে কে যেন আমার কাঁধে একটা কিছু দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল। আমি ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে। উঠে দাঁড়াবার আগেই একজন লোক আমার বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে একহাতে গলা টিপে ধরল, তার অন্যহাতে একটা ছুরি। আমি তার ছুরিধরা হাতটা চেপে ধরলাম। কাঁধের সেই আঘাতের চোটে আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল, প্রথমে গায়ে জোর পাইনি। লোকটার গায়ে খুব শক্তি। সে আমার বুকে ছুরিটা বসিয়ে দেওয়ার বদলে, মনে হল যেন সে আমার একটা চোখ খুবলে নিতে চায়। প্রায় পেরেও গিয়েছিল। এই যে আমার ভুরুর ওপর কাটা দাগ দেখছেন, এই পর্যন্ত ছুরিটা বসিয়ে দিয়েছিল। শেষ মুহূর্তে আমি অন্য হাত দিয়ে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কলাম ওর মুখে। এবার ও ছিটকে পড়তেই আমি উঠে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তারপর শুরু হল মারামারি। ওর হাতে একটা লম্বা

ছুরি ছিল বটে, আমিও লাঠিটা তুলে নিতে পেরেছি। আপনি জানেন দাদা, আমার হাতে লাঠি থাকলে কেউ ছুরি কিংবা তলোয়ার দিয়েও সুবিধে করতে পারে না। লোকটাকে কয়েক ঘা লাঠির বাড়ি কষালাম বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, ধরে ফেলা গেল না। হঠাৎ একবার লাফিয়ে ছাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাল। অন্ধকারে তার মুখও দেখতে পাইনি।

কাকাবাবু বললেন, তোমার চোখটা খুব জোর বেঁচে গেছে।

কামাল বললেন, সবচেয়ে আশ্চর্য কী জানেন দাদা, পরদিন সকালে আবার ছাদে এসে দেখি আমাদের সেই মারামারির জায়গাটায় একটা পাথরের চোখ পড়ে আছে। নিশ্চয়ই এটা সেই আততায়ীর চোখ। যখন আমি ঘুসি মেরেছিলাম, তখন খুলে পড়ে গেছে!

জোজো উত্তেজিতভাবে বলল, পাথরের চোখ! কাকাবাবু, আপনার কাছে সেই যে একটা লোক এসেছিল, তারও একটা চোখ পাথরের।

কাকাবাবু হেসে বললেন, তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। সন্তুর মনে হয়েছিল, সেই লোকটির দুচোখের দৃষ্টি দুরকম, অন্য কারণেও হতে পারে। কামাল, তোমার এই ঘটনাটা কবে ঘটেছিল?

কামাল বললেন, মাসদেড়েক আগে। ঠিক একমাস একুশ দিন।

কাকাবাবু বললেন, আমার কাছে মাত্র দু-চারদিন আগে একজন লোক এসেছিল, সম্ভবত তার পাথরের চোখ। কিন্তু সেই লোকই যে এখানে এসেছিল, তা কি বলা যায়? আরও অনেকের পাথরের চোখ থাকতে পারে।

কামাল বললেন, লোকটা চুরি-ডাকাতি করতে আসেনি। আমাকে ছাদে টেনে এনে খুন করতে চেয়েছিল, তার আগে একটা চোখ খুবলে নিয়ে

কাকাবাবু বললেন, ইংরিজিতে প্রতিশোধের ব্যাপারে বলে, অ্যান আই ফর অ্যান আই, আ টুথ ফর অ-টুথ। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। তুমি কি কখনও কারও একটা চোখ নষ্ট করে দিয়েছ?

কামাল জোরে মাথা নেড়ে বললেন, কক্ষনও না। আমি এখন ব্যবসা করি। লোকের সঙ্গে মারামারি করতে যাব কেন? সে কীসের প্রতিশোধ নিতে এসেছিল, তা কিছুই বুঝতে পারিনি। যদি আবার হামলা করে, সেইজন্য ছাদ ঘিরে দিয়েছি জাল দিয়ে।

কাকাবাবু বললেন, বেশ করেছ। সাবধানে থাকাই ভাল। ক্রিমিনালদের মধ্যে কতরকম পাগল যে থাকে তার ঠিক নেই। প্রতিশোধের নেশাতেই তারা পাগল হয়ে যায়। জানো কামাল, কদিন আগে কেউ একজন আমার ঘরে গ্যাস বোমা ছুড়ে মেরেছিল।

কামাল আঁতকে উঠে বললেন, গ্যাস বোমা? এরকম তো আগে শুনিনি!

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন তাকে চিনতে পারা যায়নি। সে যদি আবার আসে, তাকে আমি এমন শাস্তি দেব!

কামাল বললেন, আপনি এবারে ক্ষমা করা বন্ধ করুন। অন্তত জেলে ভরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

অংশু এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিল। কামালের শেষ কথাটা শুনে সে মাথা নিচু করে ফেলল।

সবাই মিলে নেমে আসা হল নীচে।

জোজো জিজ্ঞেস করল, কামালকাকু, আপনি কখন আসছেন আমাদের ডাকবাংলোতে?

কামাল বললেন, আজ তো আমার ব্যবসার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হবে। এখন তো যেতে পারব না।

জেজো বলল, আফগানিস্তানের সেই গল্পটা শুনতে হবে না? মাঝখানে এমন একটা জায়গায় থামিয়ে রেখেছেন!

কামাল বললেন, ঠিক আছে, সন্ধের পর যাব। বাকি গল্প শোনানো যাবে তখন। দিনের বেলা তোমরা একটা কাজ করতে পারো। পান্নার হিরের খনি ঘুরে এসো। গাড়ি তো আছেই সঙ্গে, ড্রাইভার চিনিয়ে নিয়ে যাবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া হল বাজারের দিকে। অংশুর জন্য কেনা হল দুজোড়া প্যান্ট-শার্ট, আর গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া। জোজো কিনে ফেলল একজোড়া চটি, সন্তু কিনল একটা মাউথ অগান।

বাজারে কত লোকজন, সবাই ব্যস্ত হয়ে কেনাকাটা করছে, দোকানদাররা খাতির করে ডাকছে খদ্দেরদের। একদল স্কুলের ছেলে একরকম পোশাক পরে চলে গেল গান গাইতে-গাইতে। একজন মোটামতন লোক রাস্তায় একটি ষাঁড়কে আদর করে কলা খাওয়াচ্ছে। কোথাও কোনও অশান্তি নেই, এখন মনেই হয় না যে পৃথিবীতে কত চোর-ডাকাত, খুনেবদমাশও ঘুরে বেড়ায়।

গাড়ি ছুটল পান্নার দিকে।

কাকাবাবুর পাশে বসেছে অংশু, কাকাবাবু তার কাঁধে একটা চাপড় মেরে বললেন, কী হে, মুখটা এমন গোমড়া করে আছ কেন?

জোজো বলল, আপনি ওর ওপর এমন দায়িত্ব চাপিয়েছেন! কবিতা মেলাতে হবে, ভেবে-ভেবে বেচারা ঘেমে যাচ্ছে!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, ওকে একটা সোজা লাইন দিলে হয় না? ধরো এইরকম : বৃষ্টি পড়ে কলকল, ভরে ওঠে নদীর জল। জলের সঙ্গে অনেক মিল দেওয়া যায়! ও পেরে যাবে!

কাকাবাবু বললেন, উঁহু! আমার মাথায় প্রথম যে লাইনটা এসেছে, সেটার সঙ্গেই মেলাতে হবে!

জোজো বলল, উল্লুকের সঙ্গে খুব ভাল মিল হয় মু–

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, এই, চুপ! তোমরা কেউ কিছু বলবে না!

সন্তুর কথা শুনে অংশুর মুখোনা একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, আবার নিভে গেল!

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে বললেন, দেখি সন্তু, মাউথ অর্গানটা কেমন কিনলি! সুর ঠিক আছে কি না বাজিয়ে দেখতে হয়।

কাকাবাবু সেটাকে ভাল করে মুছেটুছে বাজাতে লাগলেন। বেশ ভালই বাজাতে পারেন তিনি। একটু পরে মুখ তুলে বললেন, এটা কী গানের সুর বাজাচ্ছি, বুঝতে পারছিস?

সন্তু- জোজো দুজনেই দুদিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, নজরুলের গান, একসময় খুব জনপ্রিয় ছিল, কে বিদেশি মন-উদাসী, বাঁশের বাঁশি বাজায় বনে– এইটা শুনেছিস, বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস নে আজি দোল–।

বাকিটা রাস্তা কাকাবাবু বাজাতে বাজাতে গেলেন।

পান্নায় অবশ্য দেখার কিছু নেই। হিরের খনির মধ্যে ঢোকা যায় না, খুব কড়াকড়ি। এখানে কাকাবাবুকেও কেউ চেনে না। বাইরে থেকে হিরের খনির ব্যাপারটা বোঝাই যায় না। খানিকটা জায়গা উঁচু পাঁচিল আর কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, স্টেনগান হাতে নিয়ে পাহারা দিচ্ছে পুলিশ। একটা জায়গায় মাঠের মধ্যে পোড়া কয়লা আর ছাই স্তূপ হয়ে আছে। তার পাশের জমিতে চাষ করছে কৃষকরা।

সেইখানে সন্তু, জোজো আর অংশু গাড়ি থেকে নেমে কিছুক্ষণ ঘুরল। যদি মাঠের মধ্যে হঠাৎ একটা হিরে পাওয়া যায়! কত হাজার হাজার লোক যে আগে এখানে খুঁজে গেছে, তা ওদের খেয়াল নেই।

কাকাবাবু গাড়িতেই বসে আছেন, একসময় জোজো কাছে এসে বলল, কাকাবাবু, ডান দিকের সরু রাস্তাটায় দেখুন, বড় একটা তেঁতুলগাছের নীচে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, ওই গাড়িটাকে সারা রাস্তা আমাদের পেছনে-পেছনে আসতে দেখেছি। নিশ্চয়ই কোনও স্পাই আমাদের ফলো করছে।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? গাড়িটাতে কজন লোক আছে দেখেছ?

জোজো বলল, ড্রাইভার আর একজন। ড্রাইভারের খাকি পোশাক, আর অন্য লোকটির চোখে কালো চশমা, সারামুখে দাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, হুঁ, কালো চশমা আর সারামুখে দাড়ি থাকলে সন্দেহ হতে পারে ঠিকই। স্পাই হতে পারে, ডিটেকটিভ হতে পারে, ডাকাত হতে পারে। কী বলে? ড্রাইভার ছাড়া মোটে একজন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আরও কিছুক্ষণ খেলিয়ে দেখা যাক!

জোজোর কথাটা মিথ্যে নয়। ফেরার পথেও নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা দেখা গেল মাঝে-মাঝে। কখনও খুব কাছে আসছে না। এক-একবার চোখের আড়ালেও চলে যাচ্ছে।

সন্তু বলল, কাকাবাবু এক কাজ করলে হয়। এ-গাড়িটা চট করে একবার থামিয়ে আমাকে নামিয়ে দাও। আমি গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকব। ফিয়াট গাড়িটা এলে দেখে নেব ভেতরে কে আছে।

কাকাবাবু বললেন, দুর, ওসব দরকার নেই। ওর যদি স্বার্থ থাকে, ও নিজেই একসময় দেখা দেবে।

কাকাবাবু আবার মাউথ অগানটা বাজাতে লাগলেন আপন মনে।

৭. বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে

বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, এর মধ্যে কাকাবাবুর চা খাওয়া হয়ে গেছে তিনবার। সন্তু আর জোজো কিছুক্ষণ বাগানে ঘুরল। কামাল এখনও আসেননি।

জোজো আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। সে ছুটে এসে বারান্দায় বসা কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আপনাদের ডাকাতের দল ঘিরে ধরল, তারপর কী হল?

কাকাবাবু হাত নেড়ে বললেন, কামাল আসুক, কামাল আসুক। অংশু কোথায়, তাকে দেখছি না!

জোজো বলল, দুপুরে তো ওপরের ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

কাকাবাবু বললেন, কাজে ফাঁকি মেরে ঘুম? ওকে ডেকে নিয়ে এসো-

জোজো ওপরতলা ঘুরে খানিক বাদে বলল, কাকাবাবু, সে ঘরে নেই, বাথরুমে নেই, বারান্দায় নেই, কোথাও নেই, সে পালিয়েছে!

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, সত্যি পালাবে, এত সাহস হবে?

জোজো বলল, সব জায়গায় তো দেখলাম। ওর ঘরে চা দেওয়া হয়েছিল, সেই চাও খায়নি। একটা নতুন জামা-প্যান্ট পরে গেছে, বাকিগুলো ফেলে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, গেটের বাইরে পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ওদের কাছে জিজ্ঞেস করে এসো তো, অংশুকে বেরোতে দেখেছে কি না। ওরা নিশ্চয়ই নজর রাখছে।

সন্তু কাছে এসে সব শুনে বলল, আমি বাড়ির পেছন দিকটা খুঁজে দেখছি।

সমস্তটা বাগানটাই পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একপাশে নদী। পেছন দিকের বাগানে কাঁচালঙ্কা, বেগুনগাছ লাগানো হয়েছে, বড় গাছ নেই, সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না। পাঁচিলের ওপাশে ঝোপঝাড়, খানিক দূরে পাহাড় শুরু হয়েছে।

পাঁচিল বেশ উঁচু হলেও সন্তু অনায়াসে উঠে বসল। ওপাশে অনেক ঝোপঝাড়। সূর্য ঢলে পড়েছে। আকাশের পশ্চিম দিকটা লালে লাল হলেও ঝোপঝাড়ে নেমে এসেছে অন্ধকার। লাফ দিয়ে নীচে নেমে পড়ল সন্তু।

খানিকটা এদিক-ওদিক খুঁজতেই সে একটা খসখস শব্দ শুনতে পেল। কেউ পা টিপে টিপে যাচ্ছে।

সন্তু চেঁচিয়ে ডাকল, অংশুদা, অংশুদা!

অমনই কেউ জোরে ছুটতে শুরু করল। হলুদ-নীল ডোরাকাটা নতুন শার্টটা চিনতে পারল সন্তু। সে আবার বলল, অংশুদা, দাঁড়াও, যাচ্ছ কোথায়?

এদিক দিয়ে কোথায় যাবে?

সে-কথায় কান না দিয়ে আরও জোরে ছুটল অংশু। কিন্তু সে সন্তুর সঙ্গে পারবে কেন? ক্যাপ্টেন ভামিঙ্গোর সঙ্গে কোনও মানুষ দৌড়ে পারে! বুমচাক ডবাং ভুলু, বুমচাক ডবাং ভুলু বলতে বলতে যেন ঝড়ের মতন উড়ে যেতে লাগল সন্তু। একটু পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ে অংশুর কোমর ধরে ফেলল।

অংশু হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলল, আমায় ছেড়ে দাও ভাই সন্তু, আমায় ছেড়ে দাও। আমি পারব না।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

অংশু বলল, কবিতার লাইন ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি পাগল হয়ে যাব। তোমার কাকাবাবু এর চেয়ে আর যে-কোনও শাস্তি আমাকে দিন, আমি মাথা পেতে নেব। কবিতা মেলানো, ওরে বাপ রে বাপ, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

সন্তু হো-হো করে হেসে উঠল।

অংশু কাতরভাবে বলল, তুমি হাসছ? আমার যে কী কষ্ট হচ্ছে তুমি বুঝতে পারবে না। ভাল্লুক, মাল্লুক, জাল্লুক, কাল্লুক, খালুক শুধু এইসব মাথার মধ্যে ঘুরছে! এই দিয়ে পদ্য হয়? আমাকে বাঁচাও ভাই!

হাসি থামিয়ে সন্তু বলল, কবিতার জন্য কাউকে এত কষ্ট পেতে জীবনে দেখিনি! ঠিক আছে, আমি তোমাকে সাহায্য করছি। কাকাবাবু তো একটা লাইন মেলাতে বলেছে, আমি বলে দিচ্ছি, মুখস্থ করে নাও! প্রথম লাইনটা কী ছিল, বনের ধারে ফেউ ডেকেছে, নাচছে দুটো উল্লুক। এই তো? পরের লাইনটা, পরের লাইনটা, হ্যাঁ, এরকম হতে পারে, বাঘের হালুম শুনেই ভয়ে কাঁপছে সারা মুল্লুক! কী, ঠিক আছে? মুখস্থ করতে পারবে?

অংশু ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ, পারব?

সন্তু বলল, ভাল করে মুখস্থ করে নাও। আর পালাবার চেষ্টা কোরো না!

ফেরার সময় অংশু বিড়বিড় করে লাইনটা মুখস্থ করতে লাগল। পাঁচিলে ওঠার আগে সন্তু একবার তার পরীক্ষা নিল। অংশু ঠিক-ঠিক বলে দিল লাইন দুটো।

পাঁচিল টপকে এপাশে এসে সন্তু একটা লঙ্কাগাছ থেকে কয়েকটা লঙ্কা ছিঁড়ে নিল। অংশুর হাতে দিয়ে বলল, কাকাবাবুকে বলবে, তুমি এদিকে লঙ্কা তুলতে এসেছিলে। রাত্তিরে ভাতের সঙ্গে খাবে।

অংশু বলল, আমি যে একেবারে ঝাল খেতে পারি না! লঙ্কা মুখে দিলেই পেট জ্বালা করে।

সন্তু বলল, খেতে হবে না। থালার পাশে রাখবে। এখন একটা কিছু বলতে হবে তো। আমি একটা লঙ্কা খেয়ে নেব।

কাকাবাবুর হাতে আর এক কাপ চায়ের পেয়ালা। ওদের দেখে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় পাওয়া গেল?

সন্তু কিছু বলবার আগেই অংশু বলল, ওদিকে কত লঙ্কার গাছ, আর বেগুন। বেগুনগুলো এখনও ছোট-ছোট, কিন্তু কত লঙ্কা হয়েছে, লাল-লাল, দেখতে কী সুন্দর লাগে।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি, বাঃ! তুমি বুঝি খুব লঙ্কার ভক্ত?

অংশু হাতের মুঠো খুলে দেখিয়ে বলল, হ্যাঁ, লঙ্কা ছাড়া ভাত খেতে পারি। অনেক তুলে এনেছি। কাকাবাবু, লঙ্কার খেতে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ আমার মাথায় পদ্য এসে গেল। লাইনটা মিলিয়ে ফেলেছি।

কাকাবাবু বললেন, লঙ্কার খেতে কবিতার প্রেরণা? এরকম বোধ হয় পৃথিবীতে আগে কখনও হয়নি। তা হলে শুনিয়ে দাও!

অংশু জামার কলারটা ঠিক করে নিল, একবার গলাখাঁকারি দিল, তারপর বেশ জোর দিয়ে বলল,

নদীর ধারে শেয়াল ডাকছে, নাচছে একটা ভাল্লুক,
আর সবাই ভয় পেয়ে গেল, একটা বাঘ ডাকল হালুম!

জোজো খুকখুক করে হেসে ফেলল।

কাকাবাবু হাসতে গিয়েও গম্ভীরভাবে বললেন, এ আবার কী কবিতা? কতবার বলেছি, ভাল্লুক নয়, উল্লুক, উল্লুক! প্রথম লাইনটাই মনে রাখতে পারো না? আর যদি ভালুকও হয়, তার সঙ্গে হালুম আবার কী ধরনের মিল?

অংশু আড়চোখে সন্তুর দিকে তাকাল। সন্তু খুব মনোযোগ দিয়ে মুখ নিচু করে তার নিজের পায়ের জুতো দেখছে।

অংশু বলল, ঠিকই বানিয়েছিলাম সার, কিন্তু আমি বেশিক্ষণ মনে রাখতে পারি না।

জোজো বলল, কাকাবাবু, ধরে নিন এটা গদ্য কবিতা!

কাকাবাবু বললেন, না, না। ওসব চলবে না। একটা জিনিস বুঝতে পারছি। ও ছন্দটাই ধরতে পারছে না। যার কানে ঠিক ছন্দটা ধরা পড়ে না, সে কবিতা লিখতে পারে না, তাই না? সেইজন্য সকলে কবিতা লিখতে পারে না। কেউ পারে, কেউ পারে না।

অংশু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, ঠিক বলেছেন সার। কেউ পারে না। আমি সাতজন্ম চেষ্টা করলেও পারব না।

কাকাবাবু বললেন, তা বলে নিষ্কৃতি নেই। কবিতা যারা লিখতে পারে না, তারাও পড়তে পারে। পড়ে-পড়ে মুখস্থ করতে পারে। অংশু, তুমি যে-কোনও কবিতার চার লাইন আমাকে মুখস্থ শোনাতে পারো?

অংশু মাথা চুলকে খানিকক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, না সার, শুধু একটা হিন্দি গানের দুলাইন মনে পড়ছে। শোনাব?

কাকাবাবু প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, না, না, না, হিন্দি গান শোনাতে হবে। আমি বলছি বাংলা কবিতা। একটা কবিতাও জানো না! যে বাঙালির। ছেলে একটা বাংলা কবিতাও মুখস্থ বলতে পারে না, তার জেল হওয়া উচিত। জোজো, কাগজ-পেন্সিল এনে দাও তো ওকে!

জোজো দৌড়ে একটা প্যাড আর ডট পেন নিয়ে এল।

কাকাবাবু বললেন, ওকেই লিখতে দাও। যদি বানান ভুল করে, ঠিক করে দিয়ো।

তারপর কাকাবাবু ডিকটেশান দিলেন :

শুনেছো কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে, একেবারে মিষ্টি!

জোজো দুষ্টুমি করে বলল, কাকাবাবু, এই কবিতাটা আপনার খুব ফেভারিট, তাই না? এটা সুর করে আপনাকে গান গাইতেও শুনেছি। আপনি বুঝি আর অন্য কোনও কবিতা জানেন না?

কাকাবাবু বললেন, কী? সুকুমার রায়ের সব কবিতা আমার মুখস্থ। শুনবে?

এই সময় গেটের সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। তার থেকে নামলেন কামালসাহেব। জোজো অমনই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গল্প, এবার গল্প শোনা হবে।

কাকাবাবু অংশুঁকে বললেন, তোমাকে কাল দুপুর পর্যন্ত মুখস্থ করার সময় দিলাম।

কামালসাহেব একটা বড় ঠোঙাভর্তি গরম-গরম শিঙাড়া নিয়ে এসেছেন। টেবিলের ওপর ঠোঙাটা রেখে বললেন, সাতনার শিঙাড়া খুব বিখ্যাত, ভেতরে কিশমিশ আর পেস্তা, বাদাম দেওয়া থাকে।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে ইউসুফকে আর এক রাউন্ড চা বানাতে বলে দাও।

একটু পরে শুরু হল আফগানিস্তানের গল্প।

কামাল জিজ্ঞেস করলেন, কাল কোথায় যেন থেমে ছিল?

জোজো বলল, কাকাবাবু বাঘটাকে দেখে বন্দুক ছুড়লেন। বাঘটা পালাল কিন্তু সেই শব্দ শুনে ডাকাতের দল এসে ঘিরে ফেলল।

কামাল বললেন, হ্যাঁ, ছ-সাতজন ডাকাত। প্রত্যেকের কাঁধে রাইফেল। ওরা ঘোড়ায় চেপে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ায়। যারা ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য ওই পথে যাতায়াত করে, ডাকাতের দল অতর্কিতে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সব লুটপাট করে নেয়। মেরেও ফেলে। আমরা অত কিছুই জানতাম না, আমাদের সঙ্গে দামি কোনও জিনিসও ছিল না। ছ-সাতজন ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করারও প্রশ্ন ওঠে না। ওদের দেখেই আমরা হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলাম।

কাকাবাবু বললেন, ওদের ভাষা কিছুই বুঝি না। আমি কিছুটা পুস্তু ভাষা শিখেছিলাম। কিন্তু ওইসব পাহাড়ের দিকে আরও অনেক ভাষা আছে। আমার কথাও ওরা বুঝল না। মারধোরও করল না বটে, ঠেলতে-ঠেলতে নিয়ে চলল। কামাল, আমাদের নদী পার হতে হয়েছিল, তাই না?

কামাল বললেন, হ্যাঁ, এক জায়গায় পাহাড়ের বাঁকে নদী খানিকটা সরু হয়ে গেছে, কিন্তু খুব স্রোত। সেইখানে আমাদের ঘোড়াসুন্ধু পার হতে হল। আমাদের অসুবিধে হয়নি, কিন্তু ডাকাত দলেরই একটা লোক নদীতে পড়ে গিয়ে খুব হাবুডুবু খেল!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ ঠিক। তারপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা গুহার মুখে। সেখানে আরও কিছু লোক আগুন জ্বেলে বসে আছে। যদিও। গ্রীষ্মকাল, কিন্তু একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় খুব ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। সেখানেই বসে ছিল ডাকাত দলের আসল সর্দার, তার নাম জাভেদ দুরানি।

কামাল বললেন, তার চেহারার একটু বর্ণনা দিই? কাবুলিওয়ালারা এমনই। সবাই লম্বা-চওড়া হয়, কিন্তু এই লোকটি যেন একটি দৈত্য। যেমন মোটা, তেমনই লম্বা, হাত দুখানা গদার মতন, বুকটা যেন লোহার দরজা, সারা মুখের দাড়িতে মেহেদি রং লাগানো। চোখ দুটো ঠিক বাঘের মতন। একটা পাথরের ওপর বসে সে গড়গড়ার তামাক টানছিল। তাকে দেখলেই ভয় হয়।

কাকাবাবু বললেন, জাভেদ দুরানি অবশ্য ইংরিজি জানে। তাতে খানিকটা সুবিধে হল। আমি কাকুতি-মিনতির সুরে সেই ডাকাতের সর্দারকে বললাম, আমরা সামান্য পর্যটক, আমাদের সঙ্গে দামি কোনও জিনিস নেই, আমাদের মতন চুনোপুঁটিকে মেরে আপনি হাত গন্ধ করবেন কেন? আমাদের ছেড়ে দিন। তাই শুনে জাভেদ দুরানি অট্টহাস্য করে উঠল। ঠিক মেঘের ডাকের মতন সেই হাসির আওয়াজ। তারপর বলল, এখানে তো কেউ এমনি-এমনি বেড়াতে আসে না। তোমরা কী মতলবে এসেছ, ঠিক করে বলো! আমি তখন বললাম, আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে খুব আগ্রহ আছে। আফগানিস্তান আর রাশিয়ার সীমান্তের এক জায়গায় পাহাড়ে সম্রাট অশোকের শিলালিপি আছে বলে শুনেছি, মানে পড়েছি, আমরা সেই শিলালিপির ছবি তুলে আনব। এর অন্য কোনও দাম নেই। শুধু ইতিহাস নিয়ে যারা চর্চা করে, তাদের কাজে লাগবে।

সন্তু বলল, কিন্তু কাকাবাবু, তুমি বলেছিলে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্য ছিল হিন্দুকুশ পর্বত পর্যন্ত। তুমি যে-জায়গাটার কথা বলছ, সেটা তো আরও অনেক দূরে। সেখানে অশোকের শিলালিপি থাকবে কী করে?

কাকাবাবু আর কামাল পরস্পরের দিকে তাকালেন। দুজনেই হাসলেন।

কামাল বললেন, দাদা, আজকালকার ছেলেরা অনেক কিছু জানে। অনেক বেশি পড়ে। টিভিতে কতরকম ছবি দেখে। এদের ধোঁকা দেওয়া শক্ত।

কাকাবাবু বললেন, তুই ঠিক ধরেছিস সন্তু। অশোকের শিলালিপি-টিপির কথা আমরা বানিয়েছিলাম। সেসব কিছু নেই। আমরা আসলে অন্য একটা জিনিস খুঁজতে গিয়েছিলাম। সেটা ওদের বলতে চাইনি।

কামাল বললেন, ডাকাতদলের লোকরা সন্তুর মতন ইতিহাস-ভূগোল কিছু জানে না। তবু ওদের মধ্যে একজন আমাদের কথায় সন্দেহ করেছিল। সে বলে উঠল, এত সামান্য কারণে কেউ এতদূর আসে না। নিশ্চয়ই এদের অন্য কোনও মতলব আছে।

কাকাবাবু বললেন, সেই লোকটির নাম অবোধরাম পেহলবান। যদিও অবোধরাম নাম, মুখোনা সূচলো মতন, চোখ দুটো দুষ্টু বুদ্ধিতে ভরা। ওকে ডাকাতদলের মধ্যে দেখে আমরা অবাক হয়েছিলাম। সে লোকটি ভারতীয়। আফগানিস্তানে অবশ্য হিন্দু-মুসলমানে কোনও ঝগড়া নেই, তখন ভারত থেকেও অনবরত লোকজন যাতায়াত করত। ওই ডাকাতদলের সঙ্গে ব্যবসার সম্পর্ক ছিল অবোধরামের। ডাকাতরা লুটপাট করে যেসব জিনিসপত্র পেত, সেসব বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে তো, অবোধরাম করত সেই কাজ। অবোধরামের চেহারাটাও বেশ শক্তিশালী, পেহলবান তো, তার মানে পালোয়ান।

কামাল বললেন, কেন জানি না, বাঙালিদের ওপরে অবোধরামের খুব রাগ। সে আবার বলল, বাঙালিরা ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল হয়। তারা এতদূর এসেছে, তাও মাত্র দুজন, এরা নিশ্চয়ই সরকারের চর। এদের বন্দুক পিস্তল কেড়ে নিয়ে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া হোক। ডাকাতের সর্দার জাভেদ দুরানিও বলল, ঠিক। বাঙালি কাওয়ার্ড, বাঙালি লড়াই করতে জানে না, শত্রুর

সামনে পড়লে বাঙালি কাপড় নষ্ট করে ফেলে, তোমরা দুজন মাত্র বাঙালি এই পথে এসেছ, জানো না, এখানে কত বিপদ হতে পারে? কীজন্য এসেছ, ঠিক করে বলো!

কাকাবাবু বললেন, আমি তখন বললাম, সর্দার, তুমি বাঙালিদের এত নিন্দে করছ, তুমি জানো না, স্বদেশি আমলে বাঙালিরা কত লড়াই করেছে ইংরেজদের সঙ্গে? বাঙালিরাই প্রথম বোমা বানাতে শিখিয়েছে। চট্টগ্রাম পাহাড়ে বাঙালি ছেলেরা ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। তাই শুনে জাভেদ বলল, ওসব শুনতে চাই না। তোমরা আমার দলের কারও সঙ্গে লড়তে পারবে? সে হিম্মত আছে? যে-কেউ তোমাদের ঘাড় মটকে দেবে। কামাল অমনই লাফিয়ে উঠে বলল, আমি লড়তে রাজি আছি। কার সঙ্গে লড়তে হবে বলুন!

কামাল বললেন, বাঙালিদের অত নিন্দে শুনে আমার রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম, এদের হাতে যদি মরতেই হয়, লড়াই করেই মরি!

কাকাবাবু বললেন, কামালের সঙ্গে যে লড়াই করতে এল, তার প্রায় ডবল চেহারা। থাবার মতন দুটো হাত তুলে তেড়ে এল। কিন্তু কুস্তি তো শুধু গায়ের জোরে হয় না, বুদ্ধি লাগে। লোকটা একেবারে মাথামোটা। কামাল তো মরিয়া হয়ে দারুণ কায়দায় লড়ে গিয়ে খানিক বাদেই তাকে উলটে ফেলে দিল। আমি কিন্তু প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু কামাল অসাধারণ সাহস দেখিয়েছে, বাঙালির মান রেখেছে।

কামাল বললেন, আর আপনি কী করলেন দাদা? তার কোনও তুলনা হয় না। আমি জিতে যেতেই ডাকাতের সদারের মুখোনা রাগে গনগনে হয়ে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের খাপ থেকে সড়াত করে তলোয়ার টেনে বার করে তোমাদের কাকাবাবুকে সে বলল, এবার তুমি আমার সঙ্গে লড়ো! তার যা গায়ের জোর, এক কোপেই সে মুণ্ডু কেটে ফেলতে পারে। এ তো কুস্তি নয়, ওদের তলোয়ার চালাবার কত অভ্যেস আছে। আমি ভাবলাম, এইবার শেষ, প্রথমে রাজাদাদাকে মারবে, তারপর আমাকে।

কাকাবাবু বললেন, আমাদের কলেজ জীবনে ওয়াই. এম. সি. এ-তে ফেনসিং শেখানো হত। আমি সেখানে দুবছর শিখেছিলাম, মোটামুটি ভালই পারতাম। তারপর অনেকদিন অভ্যেস ছিল না। কী আর করি, রাজি হয়ে গেলাম। আমাকে একটা তলোয়ার দেওয়া হল, সবাই সরে গিয়ে মাঝখানের জায়গাটা খালি করে দিল। ওই বিশাল দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে উঠেছিল। ও যদি আমাকে একটা ঘা মারতে পারে, তা হলেই আমার শেষ! চেষ্টা করতে হবে, যাতে ও কিছুতেই আমাকে ছুঁতে না পারে। তখন তো আর আমার পা খোঁড়া ছিল না, লাফাতে পারতাম, ছুটতে পারতাম খুব। আমি জাভেদ দুরানিকে ঘিরে লাফাতে লাগলাম শুধু, ও তলোয়ার চালাচ্ছে আর আমি সরে যাচ্ছি। ইঁদুর-বেড়াল খেলা চলতে লাগল। মিনিট পনেরো এইরকম চালাবার পর একবার মাত্র ওকে একটু অন্যমনস্ক করে দিতেই আমি ওর ঠিক হাতের মুঠোর কাছে প্রাণপণে দিলাম এক আঘাত। ওর তলোয়ারটা শূন্যে উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়ল, আমি আমার তলোয়ারের ডগা ঠেকালাম ওর বুকে।

কামাল বললেন, দাদা, আপনি মোটেই ভয় পাননি। প্রথম থেকেই আপনার ঠোঁটে হাসি ছিল।

কাকাবাবু বললেন, ভেতরে ভয় ছিল ঠিকই। তবু মুখে জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখতে হয়। তাতে প্রতিপক্ষ একটু হকচকিয়ে যায়।

কামাল বললেন, বুকে তলোয়ার ঠেকানো মানেই চূড়ান্ত পরাজয়। কিন্তু দাদা তবু ডাকাতের সর্দারকে বললেন, তলোয়ারটা কুড়িয়ে এনে আবার লড়তে চান? সে খনখনে গলায় বলল, না, তুমি জিতেছ। এবার আমাকে মেরে ফেলল। আমাদের এখানকার নিয়ম, যে হারে, তাকে মরতে হয়। তুমি মারো আমাকে। দাদা বললেন, না, আমি মানুষ মারি না। সর্দার ধমক দিয়ে বলল, শিগগির মারো বলছি, নইলে আমার অপমান হবে। দাদা বললেন, তলোয়ার খেলতে বলেছিলে, খেলেছি। তোমাকে মারব কেন? আমি কাউকে মারতে চাই না। এই বলে দাদা নিজের হাতের তলোয়ারটাও ফেলে দিলেন। অন্য ডাকাতরা সবাই হাতে তলোয়ার কিংবা বন্দুক উঁচিয়ে ধরে আছে। অবোধরামের হাতে রিভলভার। জাভেদ দুরানি হাত তুলে সবাইকে বললেন, থামো! তারপর দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমার কাছে কী চাও বাঙালি? এ-পর্যন্ত আর কেউ আমার হাত থেকে তলোয়ার খসাতে পারেনি। বাঙালিদের সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ছিল।

কাকাবাবু বললেন, আমি তখন সর্দারকে একটু তোষামোদ করে বললাম, সর্দার, তুমি প্রকৃত বীর। যে-কোনও খেলাতেই জয়-পরাজয় আছে। জয়ের মতন পরাজয়টাও মেনে নিতে হয়। এবার আমি জিতেছি, পরেরবার নিশ্চয়ই তুমিই জিততে। এটা একটা খেলা, খুনোখুনি করার কী দরকার! আমরা তোমাদের কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। আমাদের ছেড়ে দাও, আমরা চলে

যাই।

কামাল বললেন, সর্দার তখন একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। দাদার কাঁধ চাপড়ে বলেছিলেন, তোমরা শুধু-শুধু পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করতে যাবে কেন? আবার অন্য দলের

হাতে পড়বে। তার চেয়ে বরং আমাদের দলে যোগ দাও। অনেক টাকা পাবে। অনেক টাকা।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ ঠিক, আমাদেরও ডাকাতের দলে ভর্তি করে নিতে চেয়েছিল বটে। আমি হাত জোড় করে বলেছিলাম, মাফ করো সর্দার, ডাকাতি করা আমাদের ধাতে সইবে না। আমরা শহরের লোক, -চারদিন পাহাড়ে ঘোরাঘুরি করে আবার শহরে ফিরে যাব। সর্দার তখন আমাকে একটা পাঞ্জা দিল। লোহার তৈরি একটা মেডেলের মতন। সেটা আমার বাড়িতে এখনও আছে। সর্দার বলেছিল, পথে অন্য ডাকাতের দল ধরলেও ওই পাঞ্জাটা দেখালে ছেড়ে দেবে। ওই অঞ্চলের সবাই জাভেদ দুরানিকে ভয় পায়।

কামাল বললেন, অবোধরাম পেহেলবান তখনও বলেছিল, সর্দার, এদের এভাবে ছাড়বেন না। এরা এই আস্তানাটা চিনে গেল, এর পর এখানে পুলিশ নিয়ে আসবে। সর্দার তাকে এক ধমক দিয়ে বলেছিল, চোপ! আমার কথার ওপর কেউ কথা বলবে না।

কাকাবাবু বললেন, সদারের একজন লোক নদী পর্যন্ত আমাদের পৌঁছে দিয়ে এল। নদী পার হয়ে শুরু হল আমাদের যাত্রা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, ওই পথে যে তোমাদের ওরকম বিপদ হতে পারে, তা তোমরা আগে আন্দাজ করতে পারোনি?

কাকাবাবু বললেন, বিপদের ঝুঁকি তো নিতেই হবে। ইতিহাসের যারা চর্চা করে, তাদের অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন মহেঞ্জোদরো-হরপ্পা আবিষ্কার করছিলেন মরুভূমির মধ্যে, তখনও সেখানে ডাকাতরা আক্রমণ করেছিল।

জোজো জিজ্ঞেস করল, ওই পাহাড়ে আর অন্য লোকজন যায় না?

কাকাবাবু বললেন, যাবে না কেন? লোকজন যাতায়াত না করলে ডাকাতরাই বা আসবে কেন? তবে যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যায়, তারা যায় দল বেঁধে, অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জন, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র থাকে, ডাকাতরা তাদের কাছে। ঘেঁষে না। ছোট দল হলেই বিপদ।

সন্তু বলল, তোমরা মাত্র দুজন গিয়েছিলে কেন? সঙ্গে আরও অনেক লোক নিয়ে যেতে পারতে না?

কাকাবাবু বললেন, অনেক লোক নিতে অনেক টাকা লাগে। আমরা যে জিনিসটার খোঁজে যাচ্ছিলাম, সেটা যে আছেই, তার কোনও নির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না। অনেকেই বিশ্বাস করেনি। অনেকটা ইংরিজিতে যাকে বলে, ওয়াইল্ড গুজ চেইজ। ভারত সরকার সেইজন্য আমাদের বেশি সাহায্য করেনি। আফগানিস্তান সরকারের সাহায্যও চেয়েছিলাম, তারা আমাদের প্রস্তাবে পাত্তাই দেয়নি। সেইজন্যই আমরা মাত্র দুজন গিয়েছিলাম। ছোট দল থাকার সুবিধেও আছে। ইচ্ছেমতন যেখানে খুশি যাওয়া যায়, যে-কোনও জায়গায় লুকিয়ে পড়া যায়।

জোজো বলল, তারপর? তারপর?

কামাল বললেন, তার পরের দিন আমরা একটা গ্রামে পৌঁছে বিশ্রাম নিলাম। গ্রামের মানুষগুলো ভারী সরল হয়। ওই গ্রামের একটা লোক এক সময় কলকাতায় এসে টাকা ধার দেওয়ার ব্যবসা করত। তখন বেশ বুড়ো হয়ে গেছে। আমরা বাঙালি শুনে কী খাতিরই করল! থাকার জন্য একটা ঘর দিল, খাওয়াদাওয়ার জন্য কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। সে কলকাতায় ভবানীপুরে থাকত, বারবার সেই গল্প করতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, শেষ পাহাড়টায় পৌঁছতে আমাদের আরও দুদিন লেগেছিল, তাই না কামাল?

কামাল বললেন, না, তিনদিন। পথে সেরকম কোনও বিপদ হয়নি। একটা গাছের ডালে চোট লেগে আমি একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলাম শুধু। আর ডাকাতের পাল্লায়

পড়তে হয়নি। অন্য ডাকাতরা বোধ হয় জেনে গিয়েছিল যে, আমাদের কাছে জাভেদ দুরানির পাঞ্জা আছে। কিন্তু মাঝে-মাঝেই মনে হত, কেউ আমাদের পেছন-পেছন আসছে। আমাদের অনুসরণ করছে। একবারও দেখতে পাইনি, কিছু-কিছু শব্দ শুনে সন্দেহ হত। শজারুটার কথা মনে আছে দাদা?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, তোরা শজারু দেখেছিস? এখন বিশেষ দেখা যায় না, প্রাণীটা খুব কমে গেছে। সারা গায়ে লম্বা লম্বা কাঁটা থাকে, যখন দৌড়ে যায়, ঝমঝম শব্দ হয়। একদিন রাত্তিরে তাঁবুতে শুয়ে ওইরকম ঝমঝম শব্দ শুনে চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিল, কোনও মেয়ে নাচছে বুঝি! কামাল বলেছিল, এরকম বনের মধ্যে এত রাতে মেয়ে কোথা থেকে আসবে, নিশ্চয়ই কোনও পেত্নি!

কামাল হেসে বলল, হ্যাঁ, সেরকমই মনে হয়েছিল বটে! তারপর টর্চের আলো ফেলে সেটাকে দেখা গেল। গায়ে অত কাঁটা থাকলেও শজারুর মাংস খুব সুস্বাদু। এক গুলিতে ওটাকে মেরে ফেলা যেত। কিন্তু বন্দুকের শব্দ হলে যদি আবার কোনও ঝাট হয়, তাই লোভ সামলেছি।

গল্পের মাঝখানে ইউসুফ মিঞা এসে বললেন, এখন আপনাদের খাবার দেব সার?

সন্তু চেঁচিয়ে বললেন, না, এখন না, এখন না, একটু পরে।

ইউসুফ মিঞা বলল, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে!

সন্তু বলল, পরে আবার গরম করে দেবেন!

কামাল একটা হাই তুলে বললেন, এই পর্যন্তই আজ থাক বরং। ইউসুফ মিঞার রান্না দ্বিতীয়বার গরম করলে আর আগের মতন স্বাদ পাওয়া যায় না

আমাকেও এবার উঠতে হবে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কামাল, তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে না?

কামাল বললেন, না দাদা, আমার ছেলেমেয়েরা অপেক্ষা করে থাকবে। আমি ওদের সঙ্গে রোজ রাত্তিরে খেতে বসি। দিনের বেলা সময় পাই না, ওরাও স্কুলে যায়। সেইজন্যই আমি রাত্তিরে বাইরে কোথাও খেতে যাই না।

জোজো বলল, আর একটু বসুন। আর একটুখানি শুনি গল্পটা।

এই সময় বাইরে হঠাৎ পুলিশের হুইল বেজে উঠল। দুজন পুলিশ ছুটে এল। গেটের কাছে দেখা গেল একজন সাদা পোশাকপরা মানুষ।

কামাল আর সন্তুও দৌড়ে গেল গেটের দিকে। তার আগেই পুলিশ সেই লোকটাকে ধরে ফেলেছে।

লোকটি কাঁচুমাচুভাবে বলল, আমি একটা চিঠি দিতে এসেছি। একজন আমাকে একশো টাকা দিয়ে বলল, এই বাংলোর সাহেবকে একটা চিঠি পৌঁছে দিতে।

লোকটি একটা খাকি লম্বা খাম বার করে দিল। তার মধ্যে ইংরিজিতে টাইপ করা একটা চিঠি। চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা :

রাজা রায়চৌধুরী, আপনি আমাকে একবার হাতেনাতে ধরে ফেলেও ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমাকে আপনি ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতে পারতেন, কিংবা পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। তার কোনওটাই আপনি করেননি। সে-কথা আমি কখনও ভুলব না। আমি অকৃতজ্ঞ নই। সেইজন্যই আপনাকে জানাচ্ছি যে, আমি খবর পেয়েছি, এখানে আপনার আরও কিছু শত্রু আছে। আপনার যে-কোনও সময়ে বিপদ হতে পারে। আমি সাধ্যমতন তাদের আটকাবার চেষ্টা করব। তবুও আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল। ইতি–
আপনার
বিশ্বস্ত সুরপ্রসাদ

কাকাবাবু চিঠিখানি পড়ে বললেন, এ কী, এ তো আমাকে ভয়-দেখানো চিঠি নয়। আমাকে সাবধান করে দিতে চেয়েছে। এরকম চিঠি তো আমায় কেউ লেখে না!

কামাল বললেন, সূর্যপ্রসাদ নিজের নাম দিয়ে আপনাকে এরকম চিঠি লিখেছে? অতি আশ্চর্য ব্যাপার! তাকে আপনি নাকখত দিইয়েছিলেন,

সে-অপমান সে ভুলে যাবে?

জোজো জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, ওই সুরপ্রসাদকে আপনি কোথায় ধরেছিলেন? কেন নাকখত দিইয়ে ছিলেন?

কাকাবাবু হেসে বললেন, আরে, সে তো আর-একটা গল্প। একসঙ্গে কত গল্প শোনাব?

৮. খাজুরাহো মন্দির দেখতে যাওয়ার পথে

খাজুরাহো মন্দির দেখতে যাওয়ার পথে কাকাবাবু অংশুর পরীক্ষা নিলেন। ভোর থেকেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশের অবস্থা দেখলে মনে হয়, সহজে এ বৃষ্টি থামবে না। আজকের দিনটা ঠিক মন্দির দেখতে যাওয়ার পক্ষে উপযুক্ত নয়, কারণ খাজুরাহো মন্দিরের এলাকাটা অনেকটা বড়। বেশ কয়েকটা মন্দির আছে, সেইসব মন্দিরের দেওয়ালের কারুকাজ দেখতেই দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা আসে। ভেতরে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় না, পায়ে হেঁটে ঘুরতে হয়। বৃষ্টিতে একদম ভিজে যেতে হবে।

কিন্তু সকালবেলা আর কিছুই করার নেই। কামাল সকালে আসতে পারবেন।, তাই আফগানিস্তানের গল্পও জমবে না। সেইজন্য কাকাবাবু সদলবলে স্টেশন-ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। চলন্ত গাড়ি থেকে দুপাশের সবুজ গাছপালার বৃষ্টিতে স্নান করার দৃশ্য দেখতেও ভাল লাগে।

খানিকটা যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, অংশু সেই কবিতাটা মুখস্থ হয়েছে?

অংশু বলল, হ্যাঁ সার। তবে আমার মনে হয়, কবিতাটায় ভুল আছে। একটু বাদ পড়ে গেছে।

কাকাবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, তাই নাকি? বাদ পড়ে গেছে? কী বাদ পড়েছে?

অংশু বলল, আপনি ফার্স্ট লাইনটা বলেছিলেন, শুনেছো কী বলে গেল সীতারাম বন্দ্যো, তাই না? ওটা সার বন্দ্যোপাধ্যায় হবে না?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারে, ব্যানার্জি হতে পারে। এমনও হতে পারত, শুনেছ কী বলে গেল সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আকাশের গায়ে নাকি টকটক গন্ধ পাওয়া যায়। কিন্তু কবি তো তা লেখেননি! কবি যেরকম লিখেছেন, সেরকমই মনে রাখতে হবে।

অংশু বলল, তা হলে বলছি, শুনুন।

শুনেছ কী বলে গেল সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশে খুব টক টক গন্ধ
সেরকম টক টক থাকে না যদি হয় বৃষ্টি
তখন চেটে দেখো, ইয়ে, তখন চেটে দেখেছি
চিনির মতন মিষ্টি।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, অনেকটা হয়েছে। কিন্তু পুরোটা ঠিক হয়নি।

জোজো প্রবল প্রতিবাদ করে বলে উঠল, অনেকটা মানে কী? কিচ্ছু হয়নি। কবিতাটা মার্ডার করে দিয়েছে। কবিতার একটা শব্দও বদলানো যায় না। একটা শব্দ ভুল হলেই পুরো কবিতাটা নষ্ট হয়ে যায়। চিনির মতন মিষ্টি, গুড়ের মতন মিষ্টি, না জিলিপির মতন মিষ্টি, তা কি আছে কবিতার মধ্যে?

জোজোর রাগ দেখে কাকাবাবু হেসে ফেললেন।

সন্তু অংশুর ফ্যাকাসে মুখ দেখে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে বলল, আহা, অনেকটা তো চেষ্টা করেছে। আর একটু চেষ্টা করলেই ঠিক-ঠিক মুখস্থ হয়ে যাবে।

জোজো বলল, কবিতায় শব্দ ভুল করলেই সেটা খুব বাজে হয়ে যায়। সেরকম কবিতা শুনলে আমার গা কিরকির করে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে জোজো, তুমি আমাদের একটা ভাল কবিতা শোনাও বরং।

জোজো অমনই শুরু করল!

অপূর্বদের বাড়ি
অনেক ছিল চৌকি টেবিল, পাঁচটা সাতটা গাড়ি!
ছিল কুকুর, ছিল বিড়াল, নানান রঙের ঘোড়া
কিছু না হয় ছিল ছসাত জোড়া;
দেউড়ি ভরা দোবে-চোবে, ছিল চাকর দাসী,
ছিল সহিস বেহারা চাপরাশি
—আর ছিল এক মাসি ...

সন্তু বলল, এটা যে খুব লম্বা কবিতা রে!

কাকাবাবু বললেন, তা হোক, শুনি। মন দিয়ে শোনো অংশু, এটা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ...

প্রায় ছপাতার কবিতা নির্ভুল মুখস্থ বলে গেল জোজো। কাকাবাবু তার পিঠ চাপড়ে বললেন, চমৎকার। সত্যি, জোজো খুব ভাল আবৃত্তি করে। ওর অনেক গুণ আছে।

জোজো বলল, বাবার সঙ্গে একবার সুইডেনে গিয়েছিলাম, রাজা রানির সামনে এই কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাতে হল। রানি তো শুনে কেঁদেই ফেললেন।

সন্তু নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, সুইডেনের রানি বুঝি বাংলা জানেন?

জোজো সগর্বে বলল, তুই জানিস না? রবীন্দ্রনাথ নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর সুইডেনের সব শিক্ষিত লোকই বাংলা পড়ে।

সন্তু বলল, ইস, তোকে একটা নোবেল প্রাইজ দিল না?

জোজো বলল, আমি যখন লিখতে শুরু করব, তখন দেবে, দেখে নিস!

কাকাবাবু বললেন, জোজো লিখতে শুরু করলে গল্পের কোনও অভাব হবে না!

অংশু সাধারণত অন্যদের কথার সময় চুপ করে থাকে। এখন সে বলল, সার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

কাকাবাবু বললেন, তুমি সবসময় আমাকে সার-সার করো কেন? সন্তু-জোজোর মতন তুমিও কাকাবাবু বলতে পারো। আমার সমান বয়েসীও অনেকে এখন আমাকে কাকাবাবু বলে!

অংশু উৎসাহিত হয়ে বলল, আপনি আমাকে পারমিশান দিচ্ছেন? আমিও আপনাকে কাকাবাবু বলতে পারি সার? আচ্ছা কাকাবাবু, এখানে এসে শুনছি, আপনার অনেক শত্রু। কেন?

কাকাবাবু বললেন, কেন? আচ্ছা, তোমার কথাই ধরা যাক। তুমি ট্রেনে ডাকাতি করতে এসেছিলে, তোমাকে ধরে যদি আমি পুলিশের হাতে তুলে দিতাম, তা হলে তোমার অন্তত তিন-চার বছর জেল হত। জেলে বসেবসে তুমি ভাবতে, ওই খোঁড়া লোকটার জন্যই আমি ধরা পড়লাম। ঠিক আছে, ব্যাটাকে দেখে নেব! জেল থেকে বেরিয়ে তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে। সেরকম অনেক ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর লোককে আমি ধরে ফেলেছি, শাস্তি দিয়েছি, আবার ক্ষমাও করেছি। তারা অনেকেই আমার শত্রু হয়ে আছে। আমার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করে। এ পর্যন্ত কেউ কিন্তু আমাকে মারতে পারেনি।

জোজো বলল, আমার বাবা আপনার নামে একটা যজ্ঞ করেছেন। তার ফল কী হয়েছে জানেন কাকাবাবু? আপনার এখন ইচ্ছামৃত্যু। আপনাকে অন্য কেউ মারতে পারবে না।

কাকাবাবু বললেন, আমি যদিও যজ্ঞ-টজ্ঞতে বিশ্বাস করি না, তবু যাই হোক, তোমার বাবাকে ধন্যবাদ!

অংশু বলল, যদি আপনাকে কেউ গুলি করে দেয়?

কাকাবাবু বললেন, তোমার কাছেও তো পাইপগান ছিল, তুমি তো গুলি করতে পারলে না?

অংশু সন্তুর দিকে তাকাল। তারপর বলল, সন্তুকে দেখলে কিছুই বোঝা যায় না। ও যে হঠাৎ অতটা লাফিয়ে উঠতে পারে–

জোজো মাঝে-মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। এবার বলল, কাকাবাবু, কালকের সেই নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা আজও পেছন পেছন আসছে–

কাকাবাবুও মুখ ঘোরালেন, কিন্তু গাড়িটা দেখতে পেলেন না।

জোজো বলল, এইমাত্র আড়ালে চলে গেল। দিনের বেলা পুলিশের গাড়িটাকে সঙ্গে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া খুব কম। বৃষ্টি ক্রমশই বাড়ছে। একটু পরে বৃষ্টির এমন তোড় হল যে, সামনের কিছু দেখাই যায় না।

কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, গাড়ি থামাও, এখন চালাবার দরকার নেই। অ্যাসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।

গাড়িটা থামানো হল রাস্তার একপাশে।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ফ্লাস্কে করে চা আনা হয়েছে না? বার কর, এখন একটু চা খাওয়া যাক।

জোজো বলল, অনেক স্যান্ডউইচও দিয়ে দিয়েছে। আমার একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।

বাইরে ঝমঝম করছে বৃষ্টি। গাড়ির সব কাচ তোলা। সবাই স্যান্ডউইচ আর চা খেতে লাগল, ড্রাইভারকেও দেওয়া হল।

একটা জিপগাড়ি এই গাড়িটা ছাড়িয়ে চলে গিয়ে থেমে গেল। তারপর আবার পিছিয়ে এল। মনে হল, এই গাড়িটাও যেন এখানে একটা বড় গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে চায়।

জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এল দুজন লোক। এ-গাড়িটার দুপাশে দাঁড়াল। জোজো একটা জানলার পাশে বসে আছে, তার কাছে দাঁড়িয়ে একজন লোক কী যেন বলতে লাগল। কাচ বন্ধ বলে কিছু শোনাই যাচ্ছে না।

কাকাবাবু বলল, জোজো, কাচটা খোলো। দেখো তো, ওরা কী চাইছে।

জোজো কাচ খুলতেই সেই লোকটি জোজোর বুকের দিকে একটা রিভলভার তুলল। অন্য লোকটির হাতেও রিভলভার।

এদিকের লোকটি হিন্দিতে বলল, নামো, নেমে এসো গাড়ি থেকে।

কাকাবাবুর এক হাতে চায়ের কাপ, অন্য হাত কোমরের কাছে। লোকটি কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে কর্কশ গলায় বলল, হাত তুলবে না, ওই অবস্থায় নেমে এসো।

কাকাবাবু সরলভাবে জিজ্ঞেস করলেন, এই বৃষ্টির মধ্যে নামব কেন?

লোকটি বিশ্রী একটা গালাগালি দিয়ে বলল, শিগগির নাম, নইলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব!

কাকাবাবু বললেন, এ কী কাণ্ড, এ যে দেখছি দিনে ডাকাতি!

হঠাৎ কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল সেই লোকটির কাঁধে। সে পড়ে গেল মাটিতে। অন্য লোকটি ছুটে চলে গেল একটা গাছের আড়ালে। সেও গুলি চালাল, এই গাড়ির দিকে নয়, পেছন দিকে।

কাকাবাবুরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন, খানিক দূরে থেমে আছে একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি। তার জানলা দিয়ে বেরিয়ে আছে একটা রাইফেলের নল।

এ-গাড়ির ড্রাইভার আর বিন্দুমাত্র দেরি না করে হুস করে স্টার্ট দিয়ে দিল। পেছন দিকে শোনা গেল দু পক্ষের গুলি বিনিময়ের শব্দ।

কাকাবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন, ব্যাপারটা কী হল বল তো, সন্তু। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। কারাই বা আমাদের ধরতে এল, কারাই বা তাদের মারতে গেল?

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, আমার মনে হয়, আপনার কোনও পুরনো শত্রুর দল আমাদের ধরে নিতে এসেছিল। এই সময়ে এসে পড়ল সূরপ্রসাদের দল। তারা আমাদের বাঁচিয়ে দিল। আমি ওই নীল ফিয়াট গাড়িটার কথা আগে বলিনি? ওতে সূর্যপ্রসাদ নিজে কিংবা ওর কোনও সহকারী সবসময় আমাদের পাহারা দিচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, সূর্যপ্রসাদের এত কী দায় পড়েছে আমাদের বাঁচাবার? ক্রিমিনালরা কারও জন্য তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে না।

সন্তু বলল, ফিয়াট গাড়ির লোকটার হাতের টিপ খুব ভাল।

গাড়িটা বেশ খানিকটা দূরে চলে এসেছে। কাকাবাবু আবার ড্রাইভারকে বললেন, এবার থামাও। গাড়ি ঘোরাতে হবে। আজ আর খাজুরাহো মন্দিরে গিয়ে কাজ নেই। কামালকে এই ঘটনাটা জানানো দরকার।

অংশু জিজ্ঞেস করল, আমরা এই রাস্তা দিয়েই আবার ফিরব?

কাকাবাবু বললেন, কেন, ভয় করছে নাকি? দিনের বেলা বড় রাস্তার ওপর মারামারি পাঁচ মিনিটের বেশি চলে। এখন গিয়ে দেখবে কিছু নেই।

ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে ভয়ে-ভয়ে আস্তে চালাতে লাগল।

একটু পরেই দেখা গেল, নীল রঙের ফিয়াটটা এদিকেই আসছে। কাকাবাবুদের গাড়িটাকে দেখতে পেয়েই সে-গাড়িটা ঝট করে থেমে গিয়ে সাঁ করে ঘুরিয়ে নিয়ে পালাতে লাগল।

কাকাবাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, জোরে চালাও তো, গাড়িটা ধরো। ওতে কে আছে, আমি দেখতে চাই।

শুরু হল দুটো গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা। কিন্তু ফিয়াট গাড়িটা ছোট, স্পিড়ও বেশি। তাকে ধরা গেল না, মিলিয়ে গেল চোখের আড়ালে।

আগে যেখানে চা খাওয়ার জন্য থামা হয়েছিল, সেখানে গোলাগুলি চালাবার চিহ্নমাত্র নেই। একটা লোকের কাঁধে তো গুলি লেগেছিলই, নিশ্চিত অনেক রক্ত পড়েছিল, বৃষ্টিতে তা ধুয়ে গেছে।

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, নীল গাড়িটা যদি আমাদের পাহারাই দিতে চায়, তা হলে আমাদের দেখে পালিয়ে গেল কেন?

সন্তু বলল, দূর থেকে উপকার করতে চায়। পরিচয় জানাতে চায় না।

অংশু জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা কাকাবাবু, নীল গাড়িটা যদি না আসত, তা হলে তো এই লোকদুটোর কথায় গাড়ি থেকে নামতেই হত। তখন আপনি কী করতেন?

কাকাবাবু বললেন, তা তো জানি না। আমি আগে থেকে কিছু ভেবে রাখি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

অংশু বলল, লোকদুটোকে যেমন হিংস্র মনে হল, আমাদের মেরে ফেলতেও পারত।

কাকাবাবু বললেন, যারা মারতে চায়, তারা প্রথমেই গুলি চালায়। ওরা আমাদের কোথাও ধরেটরে নিয়ে যেত বোধ হয়।

কাকাবাবু আর কথাবার্তায় উৎসাহ দেখালেন না। আপনমনে দুবার বললেন, উপকারী বন্ধু, উপকারী বন্ধু, তারপর গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়লেন।

গাড়ি ফিরে এল শহরে। কামালকে তাঁর বাড়ির একতলাতেই একটা দোকানঘরে পাওয়া গেল। সেখানে আরও লোক রয়েছে। কথা বলা যায় না। সবাই চলে এলেন ভেতরের বৈঠকখানায়।

সব শুনে কামাল খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, এ তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। দিনের বেলায় এরকম কাণ্ড তো এখানে কখনও শুনিনি! বাইরে থেকে এসেছে? লোক দুটোকে চিনতে পারলেন? আপনার পুরনো শত্রু?

কাকাবাবু বললেন, দুজনেরই মুখ দাড়ি-গোঁফে ঢাকা। জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। খুব সম্ভবত ভাড়াটে গুণ্ডা। অন্য কেউ পাঠিয়েছে। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। কিন্তু নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটাতে কে ছিল? তোমার কি মনে হয়, সূর্যপ্রসাদ আমাদের পাহারা দিচ্ছে?

প্রবল বেগে দুদিকে মাথা নেড়ে কামাল বললেন, আমার তা বিশ্বাস হয় না। সূর্যপ্রসাদ অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। মায়া-দয়া, কৃতজ্ঞতাবোধ, এসব কিছু তার নেই। আপনি তাকে নাকেখত দিইয়েছিলেন, সে-কথা এখানে

অনেকেই জানে। সে অপমানের সে শোধ নেবে না?

কাকাবাবু বললেন, আমি তার উপকারও করেছিলাম। খাজুরাহো মন্দিরের মূর্তিগুলো সব সে ফেরত দিয়েছিল, তাই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিইনি। তোমার সঙ্গে তার কবে দেখা হয়েছে?

কামাল বললেন, সূরপ্রসাদকে তিন-চার বছর দেখা যায় না। পুলিশও তার খোঁজ রাখে না। শরীর তেমন ভাল নয় বলে সে এখন কোথাও লুকিয়ে থাকে। সেখান থেকেই দল চালায়।

কাকাবাবু বললেন, হয়তো তার পরিবর্তন হয়েছে। অপমানের কথা ভুলে গিয়ে উপকারটাই মনে রেখেছে। নইলে ওরকম চিঠি পাঠাবে কেন?

কামাল বললেন, কী জানি! কাকাবাবু বললেন, কী ঝামেলা, কোথাও কি একটু শান্তিতে থাকা যাবে?

কামাল বললেন, আপনারা কি এখন গেস্ট হাউসে ফিরে যাবেন? দুপুরে খাওয়ার কথা তো বলে আসেননি।

জোজো বলল, খাজুরাহোর কোনও হোটেলে খেয়ে নেওয়ার কথা ছিল, সেখানে তো যাওয়াই হল না।

কামাল বললেন, বৃষ্টির দিন, আমাদের বাড়িতে আজ খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। আপনারা এখানেই খেয়ে নিন না। খিচুড়ি আর চিংড়িমাছ ভাজা। এইসব জায়গায় ইলিশমাছ পাওয়া যায় না।

জোজো প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, খিচুড়ি আমি খুব ভালবাসি!

কাকাবাবু বললেন, রোজ মোগলাই খানা খাচ্ছি, আজ খিচুড়ি খেলে মুখবদল হবে। আজ তোমার বউয়ের হাতের রান্নাও খেয়ে দেখা যাবে!

কামাল ভেতরে গিয়ে খবর দিয়ে এলেন। বৃষ্টি এখনও পড়েই চলেছে। ঠিক যেন বাংলাদেশের বর্ষা।

আধঘণ্টার মধ্যেই খাওয়ার টেবিলে বসা হল। শুধু খিচুড়ি আর চিংড়িমাছ নয়, তার সঙ্গে বেগুনভাজা, আলুভাজা, আলুবোখরার চাটনি, দই, তিনরকম মিষ্টি। খিচুড়িটা সত্যিই অতি উপাদেয় হয়েছে।

খেতে-খেতে কামাল বললেন, দাদা, দিনের বেলা এইরকম কাণ্ড হল, এবার থেকে আপনাদের সব সময় পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঘুরতে হবে। আজ আপনাদের একটা বিপদ ঘটে গেলে আমি নরেন্দ্র ভার্মার কাছে কী কৈফিয়ত দিতাম? উনি আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন, এখানে আপনাদের বিপদের আশঙ্কা আছে।

কাকাবাবু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, সবসময় পুলিশ নিয়ে ঘোরা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। এখানে আমার শরীরটা বেশ ভাল আছে, অসুখ-টসুখ সেরে গেছে। ভেবেছিলাম, এখানে সবাই মিলে গল্প করব আর বেড়াব। এর মধ্যে নরেন্দ্র আর খোঁজখবর নিয়েছিল?

কামাল বললেন, না। সেটাই একটু আশ্চর্যের ব্যাপার। উনি আপনার জন্য এত চিন্তিত ছিলেন, কিন্তু এর মধ্যে আর ফোন করলেন না। কোনও সাড়াশব্দই নেই।

কাকাবাবু বললেন, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! হয়তো আন্দামান চলে গেছে, কিংবা লাদাখ। ওকে বহু জায়গায় যেতে হয়।

কামাল বললেন, এরকম বুদ্ধিমান আর সুদক্ষ অফিসার আর দেখা যায় না! দারুণ লোক। আপনাকে খুব ভালবাসেন।

কাকাবাবু বললেন, নরেন্দ্র আমার খুব ভাল বন্ধু। দুজনে একসঙ্গে অনেক কাজ করেছি। অনেক বিপদেও পড়েছি। আফগানিস্তানেও তো শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রই এসে–

জোজো বাধা দিয়ে বলল, না, না, শেষটা আগে বলে দেবেন না! আমরা পুরো গল্পটা এখনও শুনিনি! কাকাবাবু, আমার আর রাত্তির পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকছে না। খেয়ে ওঠার পর বাকি গল্পটা আপনাদের বলতে হবে।

কামাল বললেন, এই দুপুরবেলা কি গল্প জমবে?

সন্তু বলল, কেন জমবে না? এটা কি ভূতের গল্প নাকি? ভূতের গল্প রাত্তিরে শুনতে হয়!

কামাল হেসে বললেন, নাঃ, এর মধ্যে ভূতটুত কিছু নেই।

৯. আবার বসা হল বৈঠকখানায়

খেয়ে ওঠার পর আবার বসা হল বৈঠকখানায়। কামাল একটা পান মুখে পুরলেন, কাকাবাবু পান খান না, খেলেন খানিকটা মৌরি-মশলা। মুখোমুখি দুটো সোফায় বেশ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম করে বসা যায়।

কামাল বললেন, হ্যাঁ। আমরা যে পাহাড়টায় পৌঁছলাম, তার নীচে একটা গ্রাম আছে, সেটার নাম তৈমুরডেরা। গ্রামটা ছোট, মাত্র তিরিশ-পঁয়তিরিশটি পরিবার। আমাদের দেখে সেখানকার লোকেরা খুব অবাক হল না, আরও কিছু কিছু বিদেশি নাকি সেই পাহাড়ে কীসব খোঁজাখুঁজি করে গেছে। তারা অবশ্য সবাই সাহেব। শুনে আমরা একটু দমে গিয়েছিলাম। আমরা যা খুঁজতে এসেছি, তা কি আগেই কেউ নিয়ে গেছে?

জোজো বলল, অশোকের শিলালিপি? অন্য কেউ নিয়ে যাবে কী করে?

সন্তু বলল, অশোকের শিলালিপি নয়। অন্য কিছু! চুপ করে শোন না।

কামাল বললেন, সেই গ্রাম থেকে আমরা কিছু চাল-আটা, আলু-পেঁয়াজ আর নুন কিনে পাহাড়ের ওপরে উঠে গেলাম। পাহাড়টা বেশ দুর্গম, ওপরদিকে কোনও জনবসতি নেই। গাছপালাও খুব কম। ভয়ঙ্কর খাদ আর দু-একটা গুহা আছে। ওদেশে তো আর সাধু-সন্ন্যাসী নেই, তাই গুহাগুলো ফাঁকা। আমরা আশ্রয় নিলাম সেইরকম একটা গুহায়। দিন তিনেক আমরা প্রায় চুপচাপ বসে রইলাম। আমাদের কেউ অনুসরণ করছে কি না সেটা বোঝা দরকার ছিল। আমি দুবেলা রুটি পাকাতাম কিংবা খিচুড়ি বানাতাম।

কাকাবাবু বললেন, তুমি রোজ রাঁধোনি। আমিও রাঁধতে জানি। একদিন কীরকম তেল ছাড়া শুধু নুন আর পেঁয়াজ দিয়ে আলুসেদ্ধ মেখেছিলাম!

জোজা বলল, আলুসেদ্ধ আবার রান্না নাকি? সবাই পারে!

কাকাবাবু বললেন, ওইরকম জায়গায় খিদের চোটে শুধু আলুসেদ্ধই অমৃত মনে হয়।

কামাল বললেন, তিনদিন পর শুরু হল খোঁজাখুঁজি।

জোজো বলল, এবার বলতেই হবে কী খুঁজছিলেন!

কাকাবাবু বললেন, আমরা যা খুঁজছিলাম, তা খুবই দামি জিনিস। সম্রাট কনিষ্ক একবার এক তুর্কি সুলতানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে হেরে যান। জোজো বেশি ইতিহাস শুনতে ভালবাসে না, তাই সংক্ষেপে বলছি। অনেক বড় রাজার পক্ষেও হঠাৎ কোনও ছোট রাজার কাছে হেরে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। এরকম অনেকবার হয়েছে। কনিষ্ক হেরে গেলেন বটে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করেননি, পালিয়ে যান। পরে আবার সৈন্যবাহিনী গড়ে সেই সুলতানের সঙ্গে লড়াই করেন এবং জিতেও যান। প্রথম যুদ্ধটা হয়েছিল এই কাছাকাছি অঞ্চলে, দ্বিতীয় যুদ্ধটা হয়েছিল কাবুলের কাছে। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় কনিষ্ক ছদ্মবেশ ধরেছিলেন, সেইজন্য তিনি নিজের রাজমুকুট ও আরও কিছু কিছু সম্পদ লুকিয়ে রেখে যান মাটিতে গর্ত পুঁতে। সেই জিনিসগুলো রাখার ভার দিয়েছিলেন তাঁর এক অতি বিশ্বাসী সেনাপতিকে। সে ছাড়া জায়গাটার সন্ধান অন্য কেউ জানত না। কাবুলে পৌঁছবার আগেই সেই সেনাপতিটি একটি দুর্ঘটনায় মারা যায়। সেইজন্য রাজা কনিষ্কর সেই গুপ্ত সম্পদ আর কোনওদিন উদ্ধার করা যায়নি।

জোজো বলল, তার মানে, গুপ্তধন?

কাকাবাবু বললেন, অনেকটা তাই। তবে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাট কনিষ্কের মুকুটটা খুঁজে বার করা। বুঝতেই পারছ, যে-সম্রাটের মুখোনা কেমন দেখতে ছিল তাই-ই আমরা জানি না, তাঁর একটা মূর্তিরও মুণ্ডু নেই, সেই সম্রাটের মুকুটখানারও ঐতিহাসিক মূল্য সাঙ্ঘাতিক।

জোজো বলল, এতকাল কেউ জানতে পারেনি, আপনারা কী করে জানবেন সেগুলো কোথায় লুকনো আছে?

কাকাবাবু বললেন, অনেক ঐতিহাসিক নানারকম অনুমান করেছেন। এব্যাপারে আমার নিজের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না। কিন্তু সেই সময় প্রভাকরন নামে একজন খুব বড় ইতিহাসের পণ্ডিত ছিলেন দিল্লিতে। সেই প্রভাকরন কিছু পুঁথিপত্তর আর মুদ্রা থেকে একটা থিয়োরি খাড়া করেছিলেন। সেটা মিলতেও পারে, না মেলার সম্ভাবনাই বেশি। প্রভাকরন অবশ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তিনি ঠিক জায়গাটা আবিষ্কার করেছেন। প্রভাকরন তখন বৃদ্ধ, তার ওপর তাঁর হাঁপানি রোগ। তিনি নিজে তো আর আফগানিস্তানে এসে পাহাড়-পর্বতে খোঁজাখুঁজি করতে পারবেন না, তাই একদিন আমাকে বলেছিলেন, রাজা রায়চৌধুরী, তোমার বয়েস কম, শরীরে শক্তি আছে, মনের জোরও আছে, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখবে নাকি? যদি ব্যর্থ হও, সেটা তোমার দুর্ভাগ্য, আর যদি সার্থক হও, ইতিহাসে তোমার নাম থেকে যাবে!

কামাল বললেন, তোমরা কি জানো, কাবুলের মিউজিয়ামে রাজা রায়চৌধুরীর ছবি আছে?

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, আঃ, ওসব কথা বাদ দাও। গল্পটা বলো!

কামাল বললেন, সত্যি ঘটনাটা তো ঠিক গল্পের মতন বলা যায় না। পরের কথা আগে এসে পড়ে। অন্য কথা মনে পড়ে যায়!

সন্তু বলল, তার মানে আপনারা সেই মুকুট খুঁজে পেয়েছিলেন!

কামাল বললেন, হ্যাঁ। প্রভাকরনের তত্ত্ব কেউ বিশ্বাস করেনি, শুধু আমরা দুজনে বিশ্বাস করে অত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। প্রভাকরন একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন, সেই ম্যাপ ধরে-ধরে আমরা ইঞ্চি-ইঞ্চি করে খুঁজেছি। চারদিন না পাঁচদিন লেগেছিল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কোথায় পাওয়া গেল? কোনও গুহার মধ্যে? কাকাবাবু বললেন, গুহাগুলো তো অন্যরা খুঁজতে বাকি রাখেনি। না, কোনও গুহার মধ্যে নয়। জলের নীচে।

একটা গভীর খাদের নীচে বহুকাল ধরে জল জমে আছে। দড়ি বেঁধে আমরা সেই খাদে নেমেছিলাম। ম্যাপে যেখানে পিন পয়েন্ট করা সেখানে দেখি যে জল। তখন সেই জলেই ডুব দিলাম অনেকবার। সেখানে অনেক কিছু ছিল, সব আমরা নিতেও পারিনি। একটা হাতির দাঁতের তৈরি বাক্স পেয়েছিলাম, হাতির দাঁতের তৈরি বলেই এতযুগ পরেও সেটা পচেনি। সেই বাক্সের মধ্যে ছিল রাজমুকুট। তোরা শুনে অবাক হয়ে যাবি, মুকুটটা কিন্তু সোনার তৈরি নয়। ভারত জয় করার আগে তো কনিষ্ক সম্রাট ছিলেন না, ছিলেন সাধারণ রাজা। মুকুটটা তামার তৈরি। তার ওপরে লাল ও সবুজ পাথর বসানো, সেগুলো চুনি আর পান্না। সব মিলিয়ে মুকুটটার দাম খুব বেশি নয়, কিন্তু ইতিহাসের দিক দিয়ে দাম অনেক।

জোজো জিজ্ঞেস করল, কী করে প্রমাণ হবে যে ওটা কনিষ্করই মুকুট?

কাকাবাবু বললেন, যে-কোনও জিনিসই কতদিন আগে তৈরি, তা এখন প্রমাণ করা যায়। তা ছাড়া কিংবদন্তির সঙ্গে মিলে গেছে। ওই বাক্সটা পেয়ে আমাদের কী যে আনন্দ হয়েছিল! জল-কাদা-মাখা ভূতের মতন চেহারা নিয়ে আমি আর কামাল সেই খাদের মধ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলেছি। এতদিনের পরিশ্রম সার্থক।

কামাল বললেন, ওই বাক্সটা ছাড়াও আমরা কিছু সোনা রুপোর গয়নাও পেয়েছিলাম। সেগুলো বোধ হয় রানিদের। কোনও অভিজ্ঞ ডুবুরিকে এনে খোজাখুঁজি করলে আরও অনেক কিছু পাওয়া যেত, কিন্তু আমাদের কাছে ওই মুকুটটাই ছিল যথেষ্ট।

কাকাবাবু বললেন, আইন অনুযায়ী ওইসব জিনিসই আফগানিস্তান সরকারের প্রাপ্য। যদিও আবিষ্কার করেছি আমরা, ওরা কিছুই করেনি, তবু এক দেশের সম্পদ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। কাবুলে গিয়ে গভর্নমেন্টকে সব জমা করে দিতে হবে, আমরা শুধু ছবি তুলে নিয়ে যেতে পারব।

কামাল বললেন, আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, মুকুটটা অন্তত লুকিয়ে দিল্লিতে নিয়ে আসব। কিছুদিন রেখে, বড়-বড় পণ্ডিতদের দেখিয়ে তারপর এ-দেশকে ফেরত দেব। দাদা রাজি হননি। যাই হোক, এত কষ্টের পর ওই জিনিসগুলো পেয়ে আমরা এমন আত্মহারা হয়ে

গিয়েছিলাম যে, অন্য কোনও কথা মনেই পড়েনি। দাদা বারবার বলছিলেন, সম্রাট কনিষ্কের মুকুট! সত্যি-সত্যি আমাদের হাতে। প্রভাকরন কত খুশি হবেন! কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করেনি! একটা গাছতলায় বসে আমরা এই সব বলাবলি করছি, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের গুহা সেখান থেকে অনেকটা দূরে। একটু চা খাওয়া দরকার, তবু আমরা উঠি-উঠি করেও উঠছি না। অতখানি খাদে নামা আর ওঠা, জলে বারবার ডুব দেওয়া, পরিশ্রম তো কম হয়নি, আনন্দের চোটে সেসব ভুলে গেছি, এই সময় এল বিপদ! সেই নির্জন পাহাড়ে হঠাৎ কোথা থেকে দুজন লোক আমাদের পেছন দিক থেকে হঠাৎ হাজির হল। একজনের হাতে রাইফেল, অন্যজনের হাতে রিভলভার! আমরা সাবধান হওয়ারও সময় পেলাম না। একজন আমার বুকে রাইফেলের নল ঠেকাল, আর একজন রাজাদাদার মাথার দিকে উঁচিয়ে রইল রিভলভার!

কাকাবাবু বললেন, সেই দুজনের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলাম। সে কে হতে পারে বল তো?

জোজো বলে উঠল, জাভেদ দুরানি! সেই ডাকাতের সর্দার!

কাকাবাবু বললেন, না, ওই পাহাড়ি লোকরা খুব হিংস্র হলেও একবার কথা দিলে কথা রাখে। সে আমাদের পাঞ্জা দিয়েছে, আর সে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না। সে হচ্ছে ওই অবোধরাম পেহলবান। সে গোপনে আমাদের অনুসরণ করেছিল। সে ঠিক সন্দেহ করেছিল যে, আমরা কোনও দামি জিনিসের সন্ধানে এসেছি। তার সঙ্গে মাত্র একজন লোক, আমরাও দুজন, যদি একটু আগে টের পেতাম, তা হলে ওদের খপ্পরে অমনভাবে পড়তে হত না।

কামাল বললেন, দাদার মাথার দিকে রিভলভার উঁচিয়ে অবোধরাম দাঁতে দাঁতে চেপে বলল, রাজা রায়চৌধুরী, যদি প্রাণে বাঁচতে চাও, ওই বাক্সটা আমার হাতে তুলে দাও! দাদার কোলের ওপর সেই বাক্স। ওই লোকটা যেমন নিষ্ঠুর, আমরা কোনওরকম চালাকি

করতে গেলেই ও নির্ঘাত গুলি চালাবে! আমি তো ভাবলাম, যাঃ, সব গেল! এখন প্রাণে বাঁচবার জন্য বাক্সটা দিয়ে দিতেই হবে। কিন্তু দাদা অন্য ধাতুতে গড়া!

কাকাবাবু বললেন, ভুল, কামাল, ভুল। ওই অবস্থায় সবকিছু দিয়ে দিলেও প্রাণে বাঁচা যায় না। অবোধরাম আমাদের কাছ থেকে বাক্সটা নিয়ে নেওয়ার পরও ঠিক গুলি চালাত। প্রমাণ রাখবে কেন, আমাদের মেরে রেখে চলে যেত।

অংশু কৌতূহল দমন না করতে পেরে বলে উঠল, আপনারা কী করে বাঁচলেন? দুজনের দিকেই রাইফেল আর রিভলভার?

কামাল বললেন, আমি ঘাবড়ে গেলেও ওই অবস্থায় দাদার মাথার ঠিক ছিল। উনি করলেন কী, বললেন, বাক্সটা চাও, এই নাও বলেই বাক্সটা ছুড়ে দিলেন ডান দিকে। সেদিকে পাহাড়টা ঢালু হয়ে গেছে। বাক্সটা গড়াতে লাগল, আর একটু হলেই পড়ে যেত অনেক নীচে। অবোধরাম দৌড়ে গিয়ে কোনওরকমে ধরে ফেলল বাক্সটা। দাদা করলেন কী, সেই সুযোগে লাফিয়ে উঠে অন্য লোকটার ঘাড়ে এসে পড়লেন। আমার দিকে যে রাইফেল উঁচিয়ে ছিল, সে দাদার দিকে পেছন ফিরে ছিল তো। দাদা তাকে মাটিতে পেড়ে

ফেলে কেড়ে নিলেন রাইফেলটা।

জোজো বলল, দারুণ! আমি হলেও ঠিক এইরকমই করতাম!

কামাল বললেন, তাতেও কিন্তু শেষরক্ষা হল না!

জোজো বলল, কেন? ওই লোকটার কাছে রিভলভার, আপনাদের কাছে রাইফেল। রিভলভারের চেয়ে রাইফেলের শক্তি বেশি!

কামাল বললেন, তা ঠিক। কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক থেকে। ওইরকম ব্যাপার দেখে অবোধরাম লুকিয়ে পড়ল একটা বড় পাথরের আড়ালে। আমাদের এদিকে সেরকম কিছু ছিল না। আমরা দাঁড়ালাম গাছটার পেছনে। ও গুলি চালালে আমাদেরও গুলি চালাতে

হল। দুবার এরকম গুলি বিনিময়ের পরেই অবোধরাম হাসতে-হাসতে সামনে চলে এল। তারপর বলল, রায়চৌধুরী, ওটা ফেলে দাও, ওটাতে আর কোনও কাজ হবে না! রাইফেলটায় মাত্র দুটোই গুলি ছিল, আর গুলি নেই। অবোধরামের কাছে অনেক গুলি রয়েছে। অন্য লোকটা এবার উঠেই দাদার মুখে এক ঘুসি চালাল। আমাদের আর কিছুই করার নেই। অবোধরাম বলল, তোমাদের মারতে আমার দুটোর বেশি গুলি খরচ হবে না। আর ত্যান্ডাই-ম্যান্ডাই কোরো না। রায়চৌধুরী, তুমি খুব চালাক, তাই না? পাথরের ওপর কীসব লেখাটেখার ছবি তোলার জন্য এতদূর এসেছ, এ কথা আমি বিশ্বাস করব? এইসব পুরনো জিনিস বিলেত-আমেরিকায় বহু দামে বিক্রি হয়, তোমরা সেই লোভে এসেছ। এবার মনো!

অংশু বলল, অ্যাঁ তক্ষুনি গুলি করল?

কাকাবাবু বললেন, একটু সময় নেওয়ার জন্য আমি বললাম, ও জিনিস তুমি দেশের বাইরে নিতেও পারবে না, বিক্রিও করতে পারবে না! তা শুনে অবোধরাম আরও জোরে হেসে উঠল।

কামাল বললেন, অন্য লোকটা হাতের সুখ করার জন্য আমার মুখেও একটা ঘুসি মারল। অবোধরাম তাকে বলল, রহমত, দাঁড়া, ঘুসি মেরে কেন হাতব্যথা করছিস, ওদের আরও কঠিন শাস্তি দেব! দড়ি দিয়ে ওদের হাত-পা বেঁধে ফেল! অবোধরাম রিভলবার উঁচিয়ে আছে, আমাদের বাধা দেওয়ার উপায় নেই, রহমত নামে অন্য লোকটা আমাদের দুজনকেই বেঁধে ফেলল। অবোধরাম দাদার চুলের মুঠি ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল একটু দূরে। তারপর বলল, রায়চৌধুরী, তোমাদের জন্য গুলি খরচ করে কী হবে! তোমাদের এমনভাবে রেখে যাব, যাতে একদিন ভূত হয়ে এই পাহাড়ে ঘুরবে। একটা গাছের ডালে দড়ি বেঁধে ও দাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিল।

অংশু আঁতকে উঠে বলল, অ্যাঁ তারপরও উনি বেঁচে রইলেন কী করে?

কাকাবাবু মুচকি হাসলেন।

কামাল বললেন, দেখছই তো আমরা ভূত হইনি, দিব্যি বেঁচে আছি। তারপর যা হল, সেটা শুধু রাজা রায়চৌধুরীর পক্ষেই সম্ভব। রহমত একটা ভুল করেছিল, সে আমাদের হাত পা বেঁধেছিল বটে, কিন্তু নিয়ম হচ্ছে, হাত দুটোকে পিঠের দিকে নিয়ে গিয়ে বাঁধা। সে বেঁধেছিল সামনের দিকে। সেই অবস্থায় হাত দুটো ওপরে তোলা যায়। দাদাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতেই আমি চোখ বুজে কেঁদে উঠলাম। ভাবলাম যে উনি শেষ হয়ে গেলেন, এবার আমার পালা! কিন্তু দাদা হাত দুটো তুলে মাথার ওপরের দড়িটা ধরে ফেললেন, তাতে গলায় টান লাগে না। সেই অবস্থায় দুলতে লাগলেন। তাতে মজা পেয়ে অবোধরাম বলল, কতক্ষণ দুলতে পারো দেখি! এ কথা ঠিক, ওই অবস্থায় বেশিক্ষণ দোলা যায় না, হাত কাঁপতে থাকে, তারপর হাত একটু আলগা হলেই গলায় ফাঁস লেগে জিভ বেরিয়ে যাবে। সঙ্গে-সঙ্গে শেষ। কিন্তু রাজা রায়চৌধুরীর অসীম সাহস। ওই অবস্থায় দুলতে-দুলতে উনি একবার জোরে দুলে এসে অবোধরামের মুখে জোড়া পায়ে একটা লাথি কষালেন। অবোধরাম ছিটকে পড়ে গেল। দাদা ধমকে বললেন, ইডিয়েট, গুলি কর। আমাকে মারতে চাস তো গুলি কর, নইলে আমি কিছুতেই মরব না!

কাকাবাবু বললেন, সাহসের ব্যাপার নয়। এটাও একটা কৌশল। ক্রিমিনালদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। আমি কিছু না বললে ও গুলি করত ঠিকই। আমি হুকুম দিলাম বলেই ও গুলি করবে না। তাতে আরও কিছুটা সময় পাওয়া যাবে!

কামাল বললেন, ঠিক তাই। লাথি খাওয়ার পর উঠে দাঁড়িয়ে অবোধরাম প্রথমে রাইফেলটা নিয়ে তার কুঁদো দিয়ে দাদার পায়ে দুবার খুব জোরে মারল। তারপর বলল, গুলি করব? মোটেই না? এইরকমভাবে থাক, আর তিলতিল করে মর। এই পাহাড়ে কেউ আসবে না, আর ওই দড়িও ছিড়বে না। তখন সন্ধে হয়ে এসেছে, রহমতকে নিয়ে অবোধরাম আমাদের ওই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেল!

কথা থামিয়ে কামাল বললেন, এখন এই পর্যন্ত থাক। বাকিটা আবার পরে হবে। আমার একটু কাজে বেরনো দরকার।

সন্তু-জোজো-অংশু তিনজনে একসঙ্গে বলে উঠল, না, এখানে থামলে চলবে না? আজ সবটা বলতেই হবে।

জোজো উঠে এসে কামালের পাশে দাঁড়িয়ে বলল, আপনাদের যেতেই দেব?

কাকাবাবু বললেন, আর তো বেশি নেই। কামাল, শেষ করেই দাও।

কামাল বললেন, হ্যাঁ, আর বেশি নেই অবশ্য।

জোজো বলল, সংক্ষেপ করলে হবে না। সব বলতে হবে। কাকাবাবু কী করে ফাঁসির দড়ি থেকে উদ্ধার পেলেন?

কামাল বললেন, মানুষের মনের জোর যে কতখানি হতে পারে, সেদিনই আমি বুঝলাম। তোমরা ভেবে দ্যাখো অবস্থাটা। দাদা গাছের ডাল থেকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন, আমার হাত-পা বাঁধা, আমি নড়তেচড়তে পারছি না। দাদা কোনওরকমে মাথার ওপরে দড়িটা ধরে আছেন, যে-কোনও মুহূর্তে হাত আলগা হয়ে যাবে। সেই অবস্থাতেও দুলতে-দুলতে উনি কথা বলছেন আমার সঙ্গে। আমাকে বললেন, কামাল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। কিন্তু আমি ঘাবড়াব না? চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না, কেউ আমাদের উদ্ধার করতে আসবে না। অত উঁচু পাহাড়ে কোনও লোকই আসে না। দাদা দুলতে-দুলতে গাছের ডালটা ভাঙবার চেষ্টা করলেন প্রথমে। কিন্তু সেটা খুব মজবুত ডাল, ভাঙবার কোনও লক্ষণই নেই। তখন দাদা আরও জোরে দুলে দুলে কোনওরকমে সেই ডালটায় চড়ে বসলেন।

কাকাবাবু বললেন, তারপর তো সবকিছুই সোজা হয়ে গেল। প্রথমে দাঁত দিয়ে কামড়ে-কামড়ে আমি হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। তারপর গলার ফাঁস আর পায়ের বাঁধন। এর পর লাফ দিয়ে নীচে নেমে এসে কামালকে মুক্ত করে দিলাম।

অংশু বলল, ততক্ষণে ওরা অনেক দূরে চলে গেছে নিশ্চয়ই?

কামাল বললেন, তা জানি না। তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। দৌড়ে ওদের তাড়া করারও বিপদ আছে। আমাদের কাছে অস্ত্র নেই। ওদের আছে। আমাদের তখন প্রথম কাজ নিজেদের গুহায় ফিরে যাওয়া। যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে সেখানে পৌঁছে গেলাম। এত ক্লান্ত লাগছিল যে, ইচ্ছে করছিল শুয়ে থাকতে। খিদেও পেয়েছিল খুব। দাদা কিন্তু বিশ্রাম নিতে দিলেন না। আমাদের সঙ্গে কিছু শুকনো খেজুর আর পেস্তাবাদাম ছিল, শুধু তাই খেয়েই আমরা নেমে গেলাম নীচের গুহায়। আমাদের ঘোড়া দুটো সেখানেই রাখা ছিল। গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করলাম, তারা অবোধরাম আর রহমতের মতন দুজন লোককে দেখেছে কিনা। কেউ কিছু বলতে পারল না। অন্ধকারের মধ্যে ওরা কতটা এগিয়ে গেছে কিংবা কোথায় লুকিয়ে আছে, সেটা বোঝার কোনও উপায় নেই। এদিককার রাস্তাঘাট ওরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল চেনে। রাত্তিরটা আমাদের সেই গ্রামেই থেকে যেতে হল।

কাকাবাবু বললেন, ইন্ডিয়ার লোক হয়ে অবোধরামের পক্ষে আফগানিস্তানের পাহাড়ে ডাকাতি করা অস্বাভাবিক ব্যাপার। অন্য ডাকাতরা তা মানবে কেন? ডাকাতির জিনিস বিক্রি করা নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক। এটা অবোধরাম গোপনে একটা ঝুঁকি নিয়েছে। ভেবেছিল যে আর কেউ জানতে পারবে না। সেইজন্য সঙ্গে মাত্র একজন লোক এসেছিল। ওই রহমত নামের লোকটা খুব সম্ভবত বোবা কিংবা তার জিভ কাটা। সে একটা কথাও বলেনি, কোনও শব্দও করেনি। আমরা ঠিক করলাম, অবোধরামদের তাড়া করে আমরা আর ধরতে পারব না। কিন্তু বড় ডাকাতদলের সর্দার জাভেদ দুরানির সঙ্গে দেখা করে ওর নামে নালিশ জানাব। অবোধরাম ডাকাতদলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। জাভেদ দুরানি ইচ্ছে করলেই অবোধরামকে ধরতে পারবে। সম্রাট কনিষ্কের মুকুটটা সে হয়তো আমাদের ফেরত দেবে না। তবু যদি অন্তত ছবি তুলতে দেয়, তা হলেও একটা প্রমাণ থাকবে। সেই ভেবে আমরা যাত্রা শুরু করলাম, পরদিন সকালে।

কামাল বললেন, এবার কিন্তু ভাগ্য আমাদের দিকে। জাভেদ দুরানির কাছে পৌঁছবার আগেই আমরা ওদের দেখা পেয়ে গেলাম। দ্বিতীয়দিন সন্ধেবেলা। বোধ হয় ওদের কেউ

অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, কিংবা কোনও অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল পথে, নইলে অতটা পেছিয়ে পড়ার কথা নয়। আমরা তখন যাচ্ছি। পাহাড়ের একটা উঁচু রাস্তা দিয়ে, অনেক নীচে দেখতে পেলাম ওরা বসে আছে। আগুন জ্বেলে কিছু রান্না করছে। কীরকম জায়গাটা বুঝলে? আমরা তো অনেক উঁচুতে রয়েছি, এদিকটা খাড়া পাহাড়, নামবার উপায় নেই। সরু রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে নেমে ওদের কাছে পৌঁছতে অনেকটা সময় লেগে যাবে।

ততক্ষণ ওরা থাকবে কিনা ঠিক নেই। কিংবা কাছাকাছি গেলে ওরা আমাদের ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে। ওদের দেখে সেই বাক্সটা উদ্ধার করার আশায় তোমাদের কাকাবাবু একেবারে ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু আমরা নামব কী করে? অতদূর থেকে গুলি করলেও সুবিধে হবে না। দাদা তবু বললেন, কামাল, তুমি ঘোড়া দুটো নিয়ে রাস্তা দিয়ে নীচে নেমে এসো, আমি এখান দিয়েই নামছি। আমি বললাম, আপনার মাথাখারাপ নাকি? এই খাড়া পাহাড় দিয়ে নামতে গেলেই তো ব্যালান্স রাখা যাবে না। আপনি গড়িয়ে পড়ে যাবেন। উনি বললেন, আর্মির লোকেরা এইরকম জায়গা দিয়েও নামতে পারে। শুয়ে পড়ে বুকে ভর দিয়ে দিয়ে নামতে হয়। আমি সেরকমভাবে ঠিক নেমে যাব। জানি তো, দাদা কীরকম গোঁয়ার। আমার আপত্তি শুনবেন না। দাদাকে একা ছেড়ে দিই কী করে? ঘোড়াদুটোকে সেখানে রেখে আমরা সেই ঢালু পাহাড়ে হামাগুঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলাম। এবার অবশ্য আমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে। ওদের সমান-সমান। তবু আমাদের দিক দিয়ে সুবিধে এই যে, ওরা এদিকে পেছন ফিরে বসে রাস্তার দিকে নজর রাখছে। এই পাহাড় দিয়ে যে কেউ নেমে আসতে পারে, তা ওরা স্বপ্নেও ভাবেনি। এই পাহাড়টায় ঝোপঝাড় ছিল, অন্ধকার হয়ে এসেছে, আমাদের দেখাও যাবে না। দাদা বললেন, কামাল, তুমি রহমতকে তাক করবে, আমি অবোধরামকে। অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার পর আমি আর ধৈর্য ধরতে পারলাম না, গুলি চালিয়ে দিলাম। দাদাও তা অনায়াসে করতে পারতেন, তবু অবোধরামকে মারলেন না।

সন্তু বলল, আমি জানি, কাকাবাবু কাউকে গুলি করে মারেন না। যত বড় শত্রুই হোক, তাকেও মারবেন না।

জোজো বলল, তা হলে কাকাবাবু কী করলেন?

কামাল বললেন, আমার গুলি রহমতের ডান কাঁধে লেগেছিল, সে পড়ে গিয়ে কাতরাতে লাগল। তোমাদের কাকাবাবু বাঘের মতন অনেক উঁচু থেকে এক লাফে অবোধরামের ওপর গিয়ে পড়লেন। তারপর শুরু হল গড়াগড়ি আর ঘুসোঘুসি। আমি রাইফেল তৈরি রেখেছিলাম, অবোধরাম জিতলে সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাতাম। তার দরকার হল না, একটু পরেই দাদা অবোধরামকে চিত করে ফেলে তার গলায় জুতোশুদ্ধু এক পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তার আর নড়বার উপায় রইল না। হাতির দাঁতের সেই বাক্সটা কাছেই পড়ে আছে। আমি বললাম, দাদা, আর ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই। এ-দুটোকে গুলি করে মেরে নদীতে ফেলে দেওয়া যাক। তা হলে আমরা নিশ্চিন্তে যেতে পারব। দাদা কিন্তু রাজি হলেন না। বললেন, আমরা ওদের শাস্তি দেব কেন? ওদের এখানেই গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে আমরা গিয়ে জাভেদ দুরানিকে খবর দেব। বিশ্বাসঘাতকদের যা শাস্তি হয় ওরা দেবে। দাদার সঙ্গে তর্ক করেও লাভ হল না। ওদের দুজনকে দুটো গাছের সঙ্গে বাঁধলাম। কিন্তু শাস্তি না দিয়ে চলে আসতে ইচ্ছে করছিল না। তাই আমি আচ্ছা করে কান মুলে দিলাম দুজনের। ইচ্ছে করছিল একটা করে কান ছিঁড়ে নিতে।

কাকাবাবু বললেন, তুমি রাগের চোটে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছিলে।

কামাল বললেন, হব না? অবোধরামের মতন অমন হিংস্র আর নিষ্ঠুর মানুষ আমি আর দেখিনি। তখন বলে কি জানো? আমরা চলে আসছি, সে বলল, রায়চৌধুরী, আমাকে এরকমভাবে বেঁধে রেখে যেয়ো না। জাভেদ দুরানির কাছে গেলে সে ওই মুকুটটা কেড়ে রেখে দেবে, তোমাদের কোনও লাভ হবে না। আমার কাছে তোমরা কী চাও বলো! তা শুনে আমি আরও রেগে গিয়ে বললাম, শয়তান, তুই আমার দাদাকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলি। ভেবেছিলি, সে এতক্ষণে মরেই গেছে? আমারও বাঁচার আশা ছিল না। এখন তুই নির্লজ্জের মতন ক্ষমা চাইছিস? তাতে সে বলল, ক্ষমা চাইব কেন? আমাদের ছেড়ে দিলে, আমি তোমাদের দুজনকেই এক লক্ষ টাকা দেব। তোমাদের

আমিই পৌঁছে দেব কাবুলে! আমি আবার ওর কান মুলে দিয়ে বললাম, তোমার মতন সাপকে আর কেউ বিশ্বাস করে? দাদা, আপনিও তখন খুব রেগে উঠেছিলেন, মনে আছে?

কাকাবাবু বললেন, আমাকে কেউ ঘুষ দিতে চাইলে আমি তাকে কিছু না কিছু শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। ওই এক লক্ষ টাকার কথা শুনে আমিও ওর দুগালে দুটো থাপ্পড় কষালাম।

কামাল বললেন, তখনও অবোধরাম চাচাতে লাগল, এইভাবে আমাকে মারতে পারবে না। আমি তোমাদের দেখে নেব! পৃথিবীর যেখানেই লুকিয়ে থাকো, আমি ঠিক খুঁজে বার করে প্রতিশোধ নেব! আমরা অনেক দূরে চলে এসেও ওর চিৎকার শুনতে পেলাম!

কাকাবাবু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ব্যস, এই তো হয়ে গেল গল্প। তারপর আমরা সেই মুকুটের বাক্সটা নিয়ে ফিরে এলাম কাবুলে। এবার চলল, যাওয়া যাক। গেস্ট হাউসে ফিরে আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে।

জোজো হইহই করে বলে উঠল, সে কী? সব শেষ হয়ে গেল মানে? আসল ব্যাপারটা তো জানা হল না। কাকাবাবুর পা ভাঙল কী করে?

কাকাবাবু বললেন, সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। একটা এমনি অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

অংশু বলল, বুঝেছি। ওই লোকটা, মানে অবোধরাম যখন কাকাবাবুকে ফাঁসির দড়িতে ঝুলিয়ে তারপর রাইফেলের বাঁট দিয়ে পায়ে খুব জোর মেরেছিল, তাতেই ওঁর একটা পা ভেঙে গিয়েছিল।

কামাল আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, না, তাতে পায়ের মাংস কেটে অনেক রক্ত পড়েছিল, কিন্তু হাড় ভাঙেনি। সেটা হয়েছে পরে।

জোজো দাবি জানাল, আমরা সব ঘটনাটা শুনতে চাই!

কামাল বললেন, সে-ঘটনাটা কেউ জানে না। দাদা নিজের মুখে কখনও বলবেন না জানি! দাদার একটা পা নষ্ট হয়ে গেছে আমার জন্য। উনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য চিরকালের মতন নিজের একটা পা নষ্ট করেছেন। পৃথিবীতে আর কোনও মানুষ বোধ হয় এ কাজ করত না।

কাকাবাবু বললেন, যাঃ, কী যে বলো! ওইরকম অবস্থায় পড়লে সবাই করত। আমার কোনও বিপদ হলে তুমি ঝুঁকি নিতে না?

কামাল বললেন, না দাদা, সবাই করে না। নিজেদের প্রাণের মায়া কজন তুচ্ছ করতে পারে?

বলতে-বলতে কামাল ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন!

ওরকম একজন বয়স্ক মানুষকে কাঁদতে দেখে জোজো-সন্তুরা আড়ষ্ট হয়ে গেল, আর কোনও কথা বলতে পারল না।

কাকাবাবু কামালের কাছে এসে তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বললেন, কী হল, কামাল! সে তো অনেকদিন আগেকার কথা! শান্ত হও, শান্ত হও।

কামাল চোখ মুছে বললেন, সেই কথাটা যখনই মনে পড়ে, আমি নিজেকে সামলাতে পারি না। আমার বাঁচার কোনও কথাই ছিল না। আপনি রক্ষা না করলে আজ আমার এই বাড়ি, ব্যবসা, বউ-ছেলেমেয়ে এসব কিছুই হত না।

কাকাবাবু বললেন, ওসব কথা আর ভাবতে হবে না। বলছি তো, আমারও হতে পারত। যথেষ্ট হয়েছে, এবার গল্প বন্ধ করো।

কামাল নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না, বাকিটা আমি ওদের শোনাব। বুঝলে সন্তু, এর পর যা ঘটল, তা আমারই দোষে। অতি বোকার মতন, বোকার মতন একটা অ্যাকসিডেন্ট। ওদের দুজনকে বেঁধে রেখে আমরা বড়জোর আর আধঘণ্টা গেছি। অত

কষ্টে আবিষ্কার করা কনিষ্কের মুকুট আবার ফিরে পেয়েছি বলে মনটা খুব উৎফুল্ল। পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা। সেখানকার দৃশ্য খুব সুন্দর। মাঝে-মাঝে গাছপালা, দু-একটা গাছে অচেনা ফুল ফুটে আছে। অনেক নীচে আমুদরিয়া নদী। রোদুর পড়ে রুপোর মতন চকচকে দেখাচ্ছে। আমাদের ঘোড়াদুটো যাচ্ছে পাহাড়ের খাড়া পাড়ের ধার দিয়ে। এক জায়গায় আমার ঘোড়াটা পাহাড়ের একেবারে কিনারে ঘাস খাওয়ার জন্য মুখ বাড়াল। পাশেই একটা ফুলের গাছ। আমি অন্যমনস্কভাবে সেই গাছ থেকে একটা ফুল ছিড়তে যেতেই, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে গেলাম ঘোড়া থেকে, সঙ্গে-সঙ্গে গড়াতে লাগলাম পাহাড়ের গা দিয়ে। সেখানে একটা গাছও নেই যে, ধরে ফেলব। গড়াতে-গড়াতে পড়তে লাগলাম নদীর দিকে। নদীর বুকে বড়বড় পাথরের চাঁই আর অসম্ভব স্রোত। একটু পরেই নদীটা জলপ্রপাত হয়ে নেমে গেছে!

একটু থেমে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামাল বললেন, নদীতে পড়ার আগেই। একটা পাথরে মাথা ঠকে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম! তারপর আর কেউ বাঁচে? ওইরকম অবস্থায় কাছে যদি নিজের মায়ের পেটের ভাইও থাকত, সে কী করত? চিৎকার করত, কাঁদত, দৌড়োদৌড়ি করত, আর তো কিছু করার ছিল না। আমাকে বাঁচাবার জন্য ওই পাহাড়ের ওপর থেকে লাফ দিলে একেবারে নিঘাত মৃত্যু!

কাকাবাবু বললেন, হুঁ! মায়ের পেটের ভাই থাকলে কী করত, তুমি কী করে জানলে? সব মায়ের পেটের ভাই একরকম হয় না। কেউ ভিতু, কাপুরুষ হয়, কেউ আবার ভাইয়ের জন্য প্রাণও দেয়।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনি লাফালেন? কী করে বেঁচে গেলেন?

কাকাবাবু বললেন, আমি তো চিন্তা করার বিশেষ সময় পাইনি। নদীর জলে পড়ার পর কামাল যেভাবে ওলটপালট খাচ্ছিল, তা দেখেই বুঝেছিলাম ওর জ্ঞান নেই। যদি জলপ্রপাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবে, আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না। আমি জয় মা বলে ঝাঁপ দিলাম। ওপর থেকে জলে ডাইভ দেওয়ার সময় লোকে

সাধারণত হাত দুটো সামনে রেখে, মাথা নিচু করে লাফায়। সেই অবস্থাতেও আমার মনে হল, মাথা যদি নীচের দিকে থাকে, আর নদীতে গিয়ে কোনও পাথরে আঘাত লাগে, তা হলে মাথাটা একেবারে ছাতু হয়ে যাবে। তাই আমি দাঁড়ানো অবস্থায় লাফ দিলাম সোজাসুজি। ঠিক পাথরের ওপরে গিয়েই পড়লাম, আর আমার একটা পায়ের গোড়ালির হাড়টা মট করে ভেঙে গেল।

কামাল বললেন, সেই অবস্থাতেও দাদা আমাকে জাপটে ধরে পাড়ে টেনে তুললেন।

সন্তু চোখ বুজে ফেলে বলল, ইস, সাঙ্ঘাতিক লেগেছিল নিশ্চয়ই। সেই ব্যথা নিয়েও..

কামাল বললেন, ব্যথা তো লাগবেই। দাদার পায়ের তলায় পাথরটা ভেঙে গেঁথে আছে। হুহু করে রক্ত বেরোচ্ছে। তবু দাদা মুখে একটাও শব্দ করেননি। দাঁতে দাঁত চেপে ছিলেন।

জোজো বলল, আর সেই মুকুটটা কোথায় গেল?

কামাল বললেন, সেটা তো রয়ে গেছে ওপরে। আমাদের ঘোড়া দুটো, সব। জিনিসপত্তরই তো পাহাড়ের ওপরে। দাদার হাঁটার কোনও ক্ষমতাই নেই।

আমার জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে, মাথা দিয়ে তখনও রক্ত বেরুচ্ছে, শরীর ঝিমঝিম করছে। দাদাকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দুজনে তখনও প্রাণে বাঁচব কি না তার ঠিক নেই। জিনিসপত্র উদ্ধারের আশাও রইল না।

জোজো বলল, যাঃ, মুকুটটা আবার চলে গেল?

কামাল বলল, না, যায়নি। ভাগ্য শেষপর্যন্ত সুপ্রসন্ন হল। একটু পরেই আমরা পাহাড়ের ওপরে কিছু লোকজন আর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। একবার ভাবলাম, তারা যদি অন্য ডাকাতদল হয়, তা হলে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে যাবে। প্রাণে বাঁচার জন্য আমাদের চুপচাপ লুকিয়ে থাকাই ভাল। আবার ভাবলাম, এখানে পড়ে থাকলে শেষপর্যন্ত কে আমাদের উদ্ধার করবে? ওপরের ওরা কোনও বণিকের দলও তো হতে

পারে? নদীর স্রোতের এমন আওয়াজ যে, আমরা চিৎকার করলেও ওরা শুনতে পাবে না। দাদার কোমরে রিভলভারটা ঠিক ছিল, ওটা নিয়ে শূন্যে দুবার গুলি করলেন। তাই শুনে সেই দলটা ঘোরা পথে নেমে এল নদীর কাছে।

কাকাবাবু বললেন, সেই দলের প্রথমেই কাকে দেখতে পাওয়া গেল বল তো সন্তু?

সন্তু বলল, নরেন্দ্র ভার্মা!

কামাল বললেন, ঠিক বলেছ, নরেন্দ্র ভার্মা আবার কাবুলে এসে জাভেদ দুরানির ডাকাতের দলের কথা শুনেই ভেবেছিলেন, আমরা বিপদে পড়ে যেতে পারি। আফগান সরকারের সাহায্য নিয়ে দশজন সৈনিক ও একজন কর্নেলের সঙ্গে এসেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে। ওঁরা অবশ্য অবোধরামের কথা জানতেন না। অবোধরাম আর তার সঙ্গীকেও ধরে নিয়ে এলেন কাবুলে। অবোধরাম এর আগে দিল্লিতে দুটো খুন করে পালিয়ে আফগানিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। দিল্লিতে এনে তাকে জেলে ভরে দেওয়া হল চোদ্দ বছরের জন্য।

কাকাবাবু বললেন, আমরা সম্রাট কনিষ্কের সেই মুকুট কাবুলের জাদুঘরে জমা দিলাম। এখনও যে-কেউ গিয়ে দেখতে পারে। অনেক কাগজে-টাগজে ছবি ছাপা হল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটা হইচই পড়ে গেল।

অংশু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবুর পায়ের চিকিৎসা হল কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, সেসব আর শোনার দরকার নেই। আমার পা তো ঠিকই আছে। ক্রাচ নিয়ে হাঁটতে কোনও অসুবিধা হয় না। শুধু দৌড়তে পারি না, এই যা। ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, এবার ওঠো!

১০. ছিপ দিয়ে মাছধরার খুব শখ

সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, আজকের দিনটা একটু অন্যরকমভাবে কাটাব ভাবছি। সন্তু, জোজো, অংশু, তোমরা বরং আজ এখানে বসেই গল্পটল্প করো। আমি একবেলার জন্য ঘুরে আসি।

জোজো জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথা থেকে ঘুরে আসবেন?

কাকাবাবু বললেন, অনেকদিন মাছ ধরিনি। এক সময় আমার ছিপ দিয়ে মাছধরার খুব শখ ছিল।

জোজো বলল, এখানে কোথায় মাছ ধরবেন? পুকুরটুকুর দেখিনি একটাও।

কাকাবাবু বললেন, এখান থেকে খানিকটা দূরে গেলে ছোট-ছোট পাহাড়ের শ্রেণী আছে। সেখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চমৎকার একটা নদী। আগেরবার এসে সেখানে আমি মাছ ধরেছিলাম মনে আছে।

সন্তু জোর দিয়ে বলল, আমরা মোটেই বাড়িতে বসে থাকব না। আমরাও যাব।

জোজো বলল, আমি দারুণ মাছ ধরতে পারি। একবার কাস্পিয়ান হ্রদে একটা স্টার্জন মাছ ধরেছিলাম, সেটার ওজন ছিল বাইশ কিলো!

কাকাবাবু বললেন, বাপরে, তা হলে তো তোমার সঙ্গে আমি পারব না?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, অতবড় মাছ নিয়ে কী করলি?

জোজো বলল, পেট কেটে শুধু ডিম বার করে মাছটা ফেলে দিলাম!

অংশু বলল, সে কী! অতবড় মাছ ফেলে দিলে?

জোজো অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, কিছুই জানো না। স্টার্জন মাছের ডিমেরই আসল দাম।

কাকাবাবু হেসে বললেন, তা ঠিক। জোজো, তুমি অতবড় মাছ ধরেছ, এখানে ছোটখাটো মাছধরা দেখতে তোমার ভাল লাগবে কেন? এখানে বড়জোর এক কিলো-দেড় কিলো মাছ।

জোজো বলল, জলের ধারে গেলেই আমার ভাল লাগে।

কাকাবাবু বললেন, অংশু তুমি কী করবে? তোমার তো পড়া মুখস্থ করতে হবে?

সবাইকে অবাক করে দিয়ে অংশু সেই চার লাইন কবিতা ঠিকঠাক গড়গড় করে মুখস্থ বলে গেল!

জোজো বলল, কাল অনেক রাত জেগে ওকে দুলে-দুলে মুখস্থ করতে দেখেছি।

অংশু বলল, খুব ছেলেবেলায় পড়া আর-একটা কবিতা আমার মনে পড়ে গেছে। বলব?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, শোনাও।

অংশু বলল :

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
কদমতলায় কে
হাতি নাচছে, ঘোড়া নাচছে
সোনামণির বে।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, বাঃ, তা হলে তো তোমার চাকরি পাকা। তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক।

জোজো বলল, মাছ ধরবেন, ছিপ পাবেন কোথায়? ভাল চার লাগবে।

কাকাবাবু বললেন, বাজারে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

জলখাবার খেয়ে, সঙ্গে বেশ কিছু স্যান্ডউইচ আর জলের বোতল নিয়ে বেরিয়ে পড়া হল। কামালের পাঠানো স্টেশন ওয়াগন গাড়িটা এসেছে। পুলিশের গাড়িটাও অপেক্ষা করছে বাইরে। কাকাবাবু পুলিশ পাহারায় মাছ ধরতে যেতে রাজি নন।

তিনি পুলিশের অফিসারকে ডেকে বললেন, এখন আমরা শহরে যাচ্ছি। সেখানে তো আপনাদের ফলো করার দরকার নেই। দুপুরবেলা আমরা আজ আবার খাজুরাহো যাব, তখন আপনাদের লাগবে। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করুন। শহর থেকে কয়েকটা জিনিস কেনাকাটা করে আমরা এখানেই ফিরে আসছি।

বাজারে তিনটি দোকানে মাছধরার সরঞ্জাম পাওয়া যায়। কাকাবাবুর কোনও ছিপই পছন্দ হয় না। তিনি এক দোকান থেকে আর-এক দোকানে ঘুরতে লাগলেন। দোকানদারদের মাছ ধরার বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন নানারকম।

শেষপর্যন্ত তিনি দুখানা বেশ মজবুত, হুইল দেওয়া ছিপ কিনলেন। আর অনেকখানি নাইলনের দড়ি। দোকানের সামনের রাস্তাটা যেন নদী, এইভাবে তিনি ছিপ দুটো পরীক্ষা করলেন কয়েকবার। তাঁকে দেখার জন্য ভিড় জমে গেল।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু গেস্ট হাউসের উলটো দিকে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আপনি এতক্ষণ ধরে ছিপ কিনলেন যে, সারা শহর জেনে গেল আপনি মাছ ধরতে যাচ্ছেন। কালকের কাগজে খবর ছাপা হয়ে যাবে।

কাকাবাবু হেসে বললেন, এর পর যদি মাছ ধরতে না পারি, খুব লজ্জার ব্যাপার হবে, তাই না? আগেকার দিনে বাবুরা কী করত জানিস? সকালবেলা সেজেগুজে মাছ ধরতে যেত, একটা মাছও ধরতে না পারলে বাজার থেকে মাছ কিনে এনে বাড়িতে বলত, এগুলো আমি ধরেছি!

অংশু বলল, কেউ-কেউ ইলিশমাছও কিনে এনে বলতে, পুকুরে ধরেছি।

কাকাবাবু বললেন, এখানকার শহরের অনেক ছেলেমেয়ে জানেই না যে, ইলিশমাছ কখনও পুকুরে পাওয়া যায় না।

অংশু বলল, এইসব দিকে ইলিশ পাওয়া যায় না! ইলিশ শুধু পাওয়া যায় আমাদের পশ্চিমবাংলায় আর বাংলাদেশে।

কাকাবাবু বললেন, এটা বাঙালিদের ভুল ধারণা। আরও অনেক দেশে ইলিশ পাওয়া যায়। ইলিশ হচ্ছে সমুদ্রের মাছ, বিভিন্ন দেশের নদী দিয়ে ভেতরে ঢুকে আসে ডিম পাড়ার জন্য। অবশ্য সব জায়গায় ইলিশের স্বাদ সমান নয়। আমেরিকায় কিন্তু বেশ ভাল আর বড়-বড় ইলিশ ধরা পড়ে।

জোজোকে বারবার পেছনদিকে তাকাতে দেখে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, জোজো, নীল রঙের ফিয়াট গাড়িটা আজও দেখা যাচ্ছে?

জোজো বলল, না, এখনও দেখতে পাচ্ছি না।

সন্তু বলল, আমরা কোথাও গেলে কামালকাকুকে ডেকে নেওয়ার কথা ছিল?

কাকাবাবু বললেন, থাক, ওর অনেক কাজ আছে। কাল দুপুরে আমরা ওকে কাজে যেতে দিইনি। পুলিশের গাড়িটাকেও ফাঁকি দেওয়া গেছে। আজ বেশ নিরিবিলিতে মাছধরা যাবে।

খানিকটা বাদেই পাহাড়ি রাস্তা শুরু হয়ে গেল। এখানকার রাস্তা ভাল নয়, গাড়িটা ওপরে উঠতে পারছে না। মাঝে-মাঝে ঘরর ঘরর শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবু জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছেন, এক জায়গায় এসে বললেন, ব্যস, এখানে থামাও। এখানেই নামব।

সবাই নেমে পড়ার পর তিনি গাড়ির ড্রাইভারকে বললেন, তোমার অপেক্ষা করার দরকার নেই। আমরা এখানে দুপুর অবধি থাকব। তুমি ঠিক চারটের সময় এখানে ফিরে এসো।

গাড়িটা চলে যাওয়ার পরই সব জায়গাটা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এ-রাস্তায় গাড়িটাড়ি চলে না বিশেষ। ছোট-ছোট পাহাড়, সবুজ গাছপালায় ভর্তি, মাঝে-মাঝে সরু পায়েচলা পথ।

একটা পথ নেমে গেছে নীচের দিকে। সেই রাস্তা ধরে কাকাবাবু তাঁর দলটি নিয়ে এগোলেন। কয়েক মিনিট বাদেই জল চোখে পড়ল।

জায়গাটা ভারী সুন্দর। আসার পথে নদীটা একবার চোখে পড়েছিল, তেমন কিছু বড় নয়, কিন্তু এখানে সেটা হঠাৎ এত চওড়া হয়ে গেছে যে, একটা লেকের মতন মনে হয়। পরিষ্কার টলটলে জল। এপাশে-ওপাশে কয়েকটা নৌকো বাঁধা আছে। কয়েক জায়গায় বেঞ্চ বানিয়েও দেওয়া হয়েছে। পিকনিক করার পক্ষে আদর্শ। আজ ছুটির দিন নয় বলে লোকজন নেই।

কাকাবাবু প্রথমে চার তৈরি করে জলে ছিটিয়ে দিলেন। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে জলে ফেলে নিজে একটা পাথরের ওপর বসলেন। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফাতনার দিকে।

পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই জোজো বলল, কই, মাছ উঠছে না?

কাকাবাবু বললেন, এর মধ্যেই? ধৈর্য না থাকলে তো মাছ ধরা যায় না।

অংশু বলল, এখানে বড় মাছ আছে কিনা, তাই-ই বা কে জানে? এই ছিপে ছোট মাছ ধরা যাবে না।

কাকাবাবু বললেন, সবাই এরকম কথা বললে তো পুঁটিমাছও উঠবে না। আওয়াজ শুনলেই মাছরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

একটুক্ষণ তিনি কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, আজ তোমাদের একটা পরীক্ষা নিতে চাই। ধরো, এখন থেকে বেলা তিনটে পর্যন্ত একেবারে চুপ করে থাকতে পারবে? একটা কথাও বলা চলবে না। কী, রাজি?

তিনজনেই মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, জোজোরই বেশি কষ্ট হবে। একদিন সংযম দেখাও! তোমরা তিনজন এক জায়গায় বসতেও পারবে না। আলাদা-আলাদা আমি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি না ডাকলে কেউ আমার কাছে আসবে না। কাকাবাবু পাহাড়ের ওপরদিকে তিনটে জায়গা বেছে দিলেন ওদের জন্য।

তারপর নিজের কোমর থেকে রিভলভারটা বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, তুই এটা রাখ সন্তু। যদি কিছু ঘটনা ঘটে, তবু তুই হুট করে গুলি চালাবি না। যদি গুলি করতেই হয়, আমি ইঙ্গিত দেব। আমার ডান হাতটা কানের কাছে তুলব।

সন্তু বলল, যদি কেউ এসে পড়ে আগেই তোমাকে গুলি করে? যদি হাত তুলতে না পারো?

কাকাবাবু বললেন, সেরকম যদি হয়, নিজের বুদ্ধিমতন কাজ করবি। তার আগে পর্যন্ত কিছুতেই না, আমার ইঙ্গিত ছাড়া কিছুতেই না! আর অন্যদের আবার বলছি, আমি না ডাকলে কিছুতেই আমার কাছে আসবে না! এখন যাও, যে-যার পজিশান নিয়ে বোসো। ধরে নাও, এটা একটা খেলা। মাছ ধরার মতন এ-খেলাতেও কিন্তু খুব ধৈর্য লাগবে! কোনও শব্দ করবে না।

ওরা তিনজন ওপরের দিকে উঠে গেল, কাকাবাবু আবার মাছধরতে বসলেন। অন্যদের কথা বলতে বারণ করেছিলেন, নিজেই গুনগুন করে শুরু করলেন গান, আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।

সময় যেন কাটতেই চায় না, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা...

এক ঘণ্টার একটু পরে কাকাবাবু হ্যাঁচকা টান দিয়ে একটা মাছ ধরে ফেললেন। প্রায় এক কিলো ওজনের একটা কাতলামাছ।

ওপরের লুকনো জায়গা থেকে জোজো প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কাকাবাবুর নিষেধ মনে পড়ায় নিজেই নিজের ঠোঁট চেপে ধরল। অংশু একটু এগিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল, খচমচ শব্দ হল গাছের পাতায়। সন্তু মাছধরা দেখছে না, সে রিভলভারটা নিয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে।

কাকাবাবু মাছটাকে বঁড়শি থেকে ছাড়িয়ে সেটাকে আবার ছুঁড়ে জলে ফেলে দিলেন। যেন মাছধরাতেই তাঁর আনন্দ, জ্যান্ত মাছ ধরে খাওয়ার লোভ নেই।

আবার অপেক্ষা।

জোজো শুয়ে পড়ে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। মেঘলা দিন, রোদ্দুরের তাপ নেই। অন্যদিকে অংশু ঘুমিয়ে পড়েছে একটা গাছে হেলান দিয়ে। সন্তু একটা পাথরের আড়ালে বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে।

দু ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর খুব জোরে একটা গাড়ি এসে ওপরের রাস্তায় থামল। তার থেকে দুজন লোক লাফিয়ে নেমে পড়ে খানিকটা ছুটে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাদের চেহারা ডাকাতের মতন, দুজনের হাতেই রাইফেল। গাড়ি চালাচ্ছিল একজন প্রায় বুড়ো লোক, মাথার চুল ধপধপে সাদা, লম্বা-চওড়া চেহারা, সে গাড়ি থেকে নামল একটা ছড়ি হাতে নিয়ে। ছড়িতে ভর দিয়ে ঝুঁকে-ঝুঁকে হেঁটে সে এগিয়ে এল খানিকটা।

সন্তুর বুকটা ধক করে উঠল। দুজন লোকের হাতে রাইফেল, এখন সে কী করবে? কাকাবাবুর যেন ভ্রূক্ষেপই নেই, পেছনে ফিরে তাকালেনও না।

চুলপাকা লোকটি হেঁকে বলল, রায়চৌধুরী সাব, নমস্তে। কটা মছলি পাকড়ালেন?

কাকাবাবু এবার মুখ ফিরিয়ে যেন খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, আরে সূর্যপ্রসাদ যে! নমস্তে-নমস্তে। কেমন আছ?

সূরপ্রসাদ বলল, হনুমানজির কৃপায় ভাল আছি। আপনার চারদিকে এত শত্রু, তবু আপনি একা-একা মাছ ধরতে এসেছেন?

কাকাবাবু বললেন, তোমার ভরসাতেই তো এসেছি। তোমার চিঠি পেয়েছি আমি। অন্য কেউ মারতে এলে তুমি বাঁচাবে।

সূর্যপ্রসাদ বলল, হ্যাঁ, তা তো জরুর বাঁচাব। অন্য কেউ তোমাকে মারতে পারবে না। তা হলে আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেব কী করে?

সে একজন রাইফেলধারীকে বলল, ওর কাছে কী অস্তরটস্তর আছে, সার্চ করে দ্যাখ। সাবধান, এ-লোকটা মহা ফন্দিবাজ!

সে দৌড়ে এসে কাকাবাবুর প্যান্টের পকেট ও কোমরটোমর সব টিপে দেখল। কিছুই নেই। তখন সে রাইফেলের নলটা কাকাবাবুর বুকে ঠেকিয়ে রাখল।

কাকাবাবু বললেন, মাছ ধরতে এলে কি কেউ সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল রাখে নাকি? তুমি আমাকে মেরে ফেলতে এসেছ? তুমি তো আগে শুধু মূর্তি-চুরি আর পাচার করতে, খুনটুন তো করতে না। এখন লাইন পালটেছ?

সূরপ্রসাদ বলল, এত কম্পিটিশান, টিকে থাকতে হলে লাইন পালটাতেই হয়। তবে তোমাকে আমি জানে মারব না। তুমি আমাকে অপমান করেছিলেন, আজ তার শোধ নেব। তোমাকেও আজ নাকে খত দিতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, আমি কেন নাকে খত দেব? আমি তো কোনও খারাপ কাজ করিনি। তুমি মূর্তি চুরি করেছিলে, তোমাকে জেলে দেওয়ার বদলে আমি ওইটুকু শাস্তি দিয়েছি!

সূরপ্রসাদ রাগে দাঁত কড়মড় করে বলল, আমার জেলে যাওয়া অনেক ভাল ছিল। আমাদের লাইনে জেল কেউ পরোয়া করে না। কিন্তু নাকে খত দিয়েছি বলে আমার শত্রুরা এখনও হাসে। নাও, আরম্ভ করো।

কাকাবাবু বললেন, এই পাথরের রাস্তায় নাকখত দিতে হবে? এটা ঠিক হচ্ছে না। তোমাকে আমি খত দিইয়েছিলাম খাজুরাহো মন্দিরে, সেটা প্লেন জায়গা ছিল। এই পাথরে নাক ঘষলে আমার নাক ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তারক্তি হয়ে যাবে যে!

সূরপ্রসাদ বলল, রায়চৌধুরী, তুমি আমার সঙ্গে মজাক করছ? তোমার ঘাড় ধরে মাটিতে চেপে ধরব, তাই-ই চাও?

কাকাবাবু বললেন, না, না, সেটা আরও খারাপ হবে। ঠিক আছে, কোথা থেকে শুরু করব বলো!

সূর্যপ্রসাদ বলল, এখানে এসে আমার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাবে, তারপর নাকেখত দিয়ে ওই ওপরের রাস্তা পর্যন্ত গিয়ে আবার নেমে আসবে।

কাকাবাবু বললেন, বাবাঃ, এ যে অনেকটা। ঠিক আছে, অন্য কেউ আর দেখছে না।

সূর্যপ্রসাদ বলল, ক্যামেরা এনেছি, ছবি তুলে রাখব। কাকাবাবু ক্রাচে ভর দিয়ে এগিয়ে এলেন সূর্যপ্রসাদের দিকে। হঠাৎ ওপর থেকে হুড়মুড় করে অংশু লাফিয়ে পড়ল একজন রাইফেলধারীর কাঁধে। দুজনে মাটিতে গড়াগড়ি করে অংশু কোনওক্রমে ছিনিয়ে নিল রাইফেলটা। কিন্তু সে উঠে দাঁড়াবার আগেই অন্য লোকটি তাক করে ফেলেছে তার দিকে।

কাকাবাবু হাত দুটো মুঠো করে আছেন, অর্থাৎ সন্তুকে কোনও ইঙ্গিত দিচ্ছেন। না। নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করলেন, আরে, এ লোকটা কে?

সূর্যপ্রসাদ চিৎকার করে বলে উঠল, এ তোমার দলের লোক। তোমার দলে আরও ছেলে ছিল, তারা কোথায় গেল!

কাকাবাবু বললেন, তাদের তো আমি নিয়ে আসিনি। এ কী করে চলে এল?

সূরপ্রসাদ বলল, কুছ পরোয়া নেই। রায়চৌধুরী, আমার পায়ে মাথা দাও!

হাতের ছড়িটা দিয়ে সে সপাং করে এক ঘা কষাল অংশুর পিঠে।

কাকাবাবু এবার কঠোরভাবে বললেন, সূর্যপ্রসাদ, ওকে মেরো না। শোনো আমার কথা। তুমি আমাকে নাকে খত দিতে বাধ্য করালে তারপর আমি তোমাকে ছাড়ব? এবার ঠিক জেলে ভরে দেব!

সূর্যপ্রসাদ বলল, আরে বাঙালি, তোমার কত মুরোদ, এবার দেখব। তোমাকে আগে নাকে খত দিইয়ে সেটা ফোটো তুলে সবাইকে দেখাব। এখান থেকে যাওয়ার আগে তোমাকে খুন করে সেই লাশ জলে ভাসিয়ে দেব!

কাকাবাবু বললেন, আমাকে খুন করা এত সোজা? দেব না নাকে খত, তুমি কী করতে পারো?

সূরপ্রসাদ কাকাবাবুকে মারার জন্য ছড়িটা তুলতেই তিনি সেটা ধরে ফেলে হ্যাঁচকা টান দিলেন। তারপর কানে হাতে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপর থেকে ছুটে এল একটা নয়, দুটো গুলি। একজন রাইফেলধারী মাটিতে পড়ে কাতরাতে লাগল। একটা গুলি লাগল সূর্যপ্রসাদের কাঁধে। অন্য। রাইফেলধারীটা ওপরের দিকে তাক করতে করতে আবার দুটো গুলি ছুটে এল। সেও ঘায়েল হয়ে গেল! দুদিক থেকে দুটো গুলি আসায় কাকাবাবুও অবাক! তিনি ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছেন কামাল।

কাকাবাবু বললেন, আরে, তুমি কোথা থেকে এলে?

কামাল বললেন, আপনি মাছ ধরতে গেছেন শুনেই বুঝলাম, ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে এনেছেন। তাই সঙ্গে রাইফেল নিয়ে ছুটে এসেছি। এসেই দেখি, দলবল নিয়ে উপস্থিত সূরপ্রসাদ।

কাকাবাবু বললেন, দলবল তো নয়, মাত্র দুটো লোক। এদের আমরাই ব্যবস্থা করতে পারতাম। সন্তুকে তুমি টিপ দেখাবার চান্সই দিলে না। সূর্যপ্রসাদকে নিয়ে এখন কী করা যায়? আবার নাকখত দিইয়ে ছেড়ে দেব?

কামাল বললেন, কিছুতেই না। ওকে পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজছে। বুড়ো বয়েসেও ওর লোভ যায়নি। জেলই ওর ঠিক জায়গা।

কাকাবাবু বললেন, দড়ি এনেছি, ওদের বেঁধে রাখো।

জোজো আর সন্তুও নেমে এসেছে। সন্তু বলল, কাকাবাবু, তুমি ইঙ্গিত দিতে এত দেরি করছিলে কেন?

কাকাবাবু বললেন, দেখছিলাম গুলি না চালিয়েও ওদের জব্দ করা যায় কি না। আচ্ছা অংশু, তুমি কোন সাহসে একজনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লে? আমি বারণ করেছিলাম না?

অংশু বলল, আপনাকে নাকে খত দিতে বলল শুনেই রাগে আমার গা জ্বলে উঠল। আর থাকতে পারলাম না। আমি ভাবলাম, আমি একজনকে ধরতে পারলেই সন্তু আর একজনকে গুলি করবে।

কাকাবাবু বললেন, রেলের ডাকাতরা তো এত সাহসী হয় না। তোমার সাহস দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি।

অংশু বলল, ও-কথা আর বলবেন না সার। আমি চিরকালের মতন ওই লাইন ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, তা হলে তোমাকে পুলিশই একটা চাকরি দেওয়া যেতে পারে। তোমার মতন লোকরাই চোর-ডাকাতদের ভাল সামলাতে পারবে।

কামাল আর সন্তু মিলে তিনজনকেই বেঁধে ফেলেছে। এই সময় ভটভট শব্দ করতে-করতে এঞ্জিন লাগানো একটা নৌকো এদিকে এগিয়ে এল। তাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বামতন মানুষ, চোখে কালো চশমা। হাতে তার বড় একটা অস্ত্র। স্টেনগান কিংবা এ. কে. ফরটি সেভেন।

চোখের নিমেষে এই অস্ত্র থেকে একসঙ্গে অনেক গুলি ছুটে আসে।

লোকটি কর্কশ গলায় বলল, সবাই হাত তুলে দাঁড়াও! যে নড়াচড়া করবে, তার আগে প্রাণ যাবে।

ওর হাতের অস্ত্রটি দেখলেই ভয় করে। সবাই হাত তুলতে বাধ্য হল। কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, এ আবার কে?

কামাল বললেন, গলার আওয়াজটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

নৌকোটা পারের কাছে আসতেই লোকটি একলাফে নেমে পড়ল। একহাতে অস্ত্রটা উঁচিয়ে রেখে নৌকোর দড়িটা বাঁধল একটা গাছের সঙ্গে। তারপর খুলে ফেলল চোখের কালো চশমাটা।

কামাল প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, এ কী?

কাকাবাবু বললেন, অবোধরাম!

অবোধরাম বলল, রায়চৌধুরী, মনে আছে আমাকে?

কাকাবাবু বললেন, মনে থাকবে না? কী আশ্চর্য যোগাযোগ! কদিন ধরে আমরা তোমার কথাই বলছিলাম। এই ছেলেদের সেই গল্প শোনাচ্ছিলাম। আর তুমি এসে হাজির! গল্পের মধ্যে গল্পের ভিলেনের সশরীরে আবিভাব!

অবোধরাম বলল, মনে নেই, আমি বলেছিলাম, আবার দেখা হবে?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাও মনে আছে। কিন্তু সেটা তো কথার কথা! তোমার তো যাবজ্জীবন জেলে থাকার কথা ছিল। তুমি এখানে কী করে?

সত্যি তুমি এসেছ, না ভুল দেখছি!

অবোধরাম বলল, সত্যি কি ভুল তা একটু পরেই মালুম হবে! তোমার স্যাঙাতটাও এখানে রয়েছে দেখছি! এর কথা আমার মনেই ছিল না।

কাকাবাবু বললেন, জেল থেকে বেরোলে কী করে? আগেই ছেড়ে দিল?

অবোধরাম বলল, আমাকে আটকে রাখতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও জেল নেই। প্রতিশোধ নেব বলেছিলাম। আমরা কখনও অপমান ভুলি না!

কাকাবাবু হতাশ হওয়ার ভাব দেখিয়ে বললেন, কত লোকই যে আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু কেউ পারে না শেষ পর্যন্ত। তুমি একা এসেছ? তোমার সাহস তো কম নয়! আমরা এখানে এতজন আছি।

অবোধরাম বলল, আমি একাই একশো। আমার হাতে কী আছে দেখেছ? এক মিনিটেই তোমাদের সবাইকে শেষ করে দিতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, এসব অস্ত্র তোমরা জোগাড় করো কী করে?

অবোধরাম হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, চোপ! বড় বেশি কথা বলছ। কয়েক পা এগিয়ে এল। সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। তারপর বলল, এই ছেলেগুলোকে আমার

দরকার নেই। রায়চৌধুরী, তুমি আর তোমার স্যাঙাত নৌকোয় ওঠো। তোমাদের দুজনকে আমি নিয়ে যাব।

কাকাবাবু কিছুই না বোঝার ভান করে বললেন, নৌকোয় উঠব কেন? বেড়াতে নিয়ে যাবে নাকি আমাদের?

অবোধরাম চিৎকার করে বলল, ওঠো বলছি! তোমাদের দুজনকে আমি এমন জায়গায় পাঠাব যে, কেউ আর কোনওদিন খুঁজেও পাবে না।

কাকাবাবু বললেন, অবোধরাম পালোয়ান, চেঁচিয়ো না। তুমি ফাঁদে পড়ে গেছ। এবার আর তোমার পালাবার আশা নেই।

অবোধরাম অট্টহাসি দিয়ে বলল, ফাঁদ! কীসের ফাঁদ? চালাকি করতে যেয়ো না রায়চৌধুরী, তা হলে এই ছেলেগুলোও মরবে! নৌকোয় ওঠো!

কাকাবাবু বললেন, যদি না উঠি?

অবোধরাম বলল, তা হলে তোমার চোখের সামনে একজন একজন করে মারব। সবশেষে তোমাকে!

কাকাবাবু বললেন, ওহে পালোয়ান, একটা ওইরকম অস্ত্র জোগাড় করলেই হয় না, ঠিকমতন চালানো শিখতে হয়। তুমি চলে এসেছ আমাদের মাঝখানে। আমাদের সবাইকে আগে একসার দিয়ে দাঁড় করানো উচিত ছিল।

অবোধরাম অমনই কাকাবাবুর বুকের দিকে তাক করে উঠল, দাঁড়াও, সবাই এক লাইন করে দাঁড়াও!

কাকাবাবু বললেন, আহা, হা, এখন আর কেউ নড়বে না। এখন তুমি আমাদের মধ্যে শুধু একজনকেই মারতে পারবে। একজনকে যে-ই মারবে, অমনই পেছনদিক থেকে একজন

তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের মধ্যে একজন কে প্রাণ দেবে? আমি, আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, আমি মরলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু তারপর তুমি বাঁচবে না, অবোধরাম।

একটু হেসে কাকাবাবু বললেন, নাও, আমাকে মারো, তোমার ঠিক পেছনে চলে এসেছে কামাল, তার হাতে রয়েছে ছুরি। ডান দিকে আমার ভাইপো সন্তু, তার হাতের টিপও দারুণ। এবার এসো অবোধরাম, প্রতিশোধ নাও!

অবোধরাম চকিতে পেছন ফিরে কামালকে দেখার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বিদ্যুতের মতন একটা ক্রাচ তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তার হাতে। অস্ত্রটা পড়ে যেতেই সন্তু চোখের নিমেষে সেটা তুলে নিল!

কাকাবাবু বললেন, যাঃ অবোধরাম, তোমার যে আর প্রতিশোধ নেওয়া হল!

অবোধরামের মুখোনা বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

কামাল হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, দাদা, দাদা, আপনি যে অসাধ্যসাধন করলেন! এবার যে বাঁচব, ভাবতেই পারিনি। এ লোকটা যদি আগে আমার দিকে গুলি চালিয়ে দিত!

কাকাবাবু বললেন, আমি আগে অনেকবার দেখেছি, কারও চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে আমি যদি ধমকে বলি, মারো, আমায় মারো, তাতে অন্যরা তক্ষুনি গুলি করতে পারে না।

জোজো বলল, হিপনোটাইজড হয়ে যায়। আমার বাবা একবার স্পেনে গুণ্ডার দলের মধ্যে পড়ে...

জোজোকে গল্প বলতে না দিয়ে কামাল বললেন, সন্তু, এসো, একে আগে বেঁধে ফেলা যাক।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ওই অস্ত্রটা সম্বন্ধে সাবধান। ভারী ডেঞ্জারাস। ওটা নামিয়ে রাখো বরং।

সন্তু সেটা নামাবার আগেই অবোধরাম লাফিয়ে গিয়ে জোজোকে চেপে ধরল। তার হাতে একটা লম্বা ছুরি। ছুরির ডগাটা সে জোজোর গলায় চেপে ধরেছে। বিকৃত গলায় বলে উঠল, রায়চৌধুরী, এবার? আমার অস্ত্রটা ফেরত দাও, না হলে এ-ছেলেটা মরবে!

কাকাবাবু বললেন, আঃ, বারবার এই ভুল হয়। একজন যে দুটো অস্ত্র রাখতে পারে, সেটা মনে থাকে না। আগেই ওকে সার্চ করা উচিত ছিল।

অবোধরাম বলল, দাও, অস্ত্রটা ফেরত দাও!

কাকাবাবু বললেন, নাঃ, ওই অস্ত্র তুমি ফেরত পাবে না।

কামাল বললেন, এবারেও তোমার সুবিধে হবে না অবোধরাম। ওই ছেলেটাকে মারার চেষ্টা করলেই আমরা তোমাকে গুলি করব। আমাদের দলের বড়জোর একজন মরবে।

অবোধরাম জোজোকে টানতে-টানতে নৌকোর কাছে নিয়ে গেল। এখন তার পেছনদিকে আর কেউ নেই। এখন অস্ত্রটা হাতে পেলে সে একসঙ্গে সকলের দিকে গুলি চালাতে পারবে।

অবোধরাম বলে উঠল, আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে অস্ত্রটা ফেরত না দিলে আমি এই ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোয় উঠে চলে যাব। এক-দুই-তিন-চার।

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, দাঁড়াও! জোজো পরের বাড়ির ছেলে। আমরা ওর জীবনের ঝুঁকি নিতে পারি না। সন্তু, অস্ত্রটা আমাকে দে। তোরা সব আড়ালে চলে যা। আমি ওকে অস্ত্রটা ফেরত দেব।

অবোধরাম বলল, ছুড়ে দিলে চলবে না। এই ছেলেটাকে আমার সামনে দাঁড় করাব, তারপর ওটা আমার হাতে তুলে দেবে।

কাকাবাবু অস্ত্রটা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর মুখের একটা রেখাও কাঁপছে না। অস্ত্রটা হাতে পেলে অবোধরাম যে প্রথমে তাঁকে ধরবে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

একেবারে কাছে এসে তিনি বললেন, জোজো, কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।

তিনি অস্ত্রটা অবোধরামকে দেওয়ার জন্য উঁচু করলেন, অবোধরাম একহাত বাড়াল।

ঠিক তখনই কোথা থেকে একটা গুলি এসে লাগল অবোধরামের সেই হাতে। সে আঃ করে এক দৌড় লাগাতেই জোজো এক দৌড় লাগাল।

ঠিক পাশের বড় পাথরটার ওপর এসে দাঁড়াল একজন মানুষ, তার হাতে রিভলভার। সে বলল, খেল খতম! আর কেউ আছে নাকি?

সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেই মানুষটি নরেন্দ্র ভার্মা!

নরেন্দ্র ভার্মা আবার বললেন, অবোধরাম, আমি ইচ্ছে করে তোমার মাথায় গুলি চালাইনি। তুমি নৌকোয় ওঠার চেষ্টা করলে কিন্তু প্রাণে বাঁচবে না! কামালসাহেব, ওকে বেঁধে ফেলুন!

পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে নেমে এলেন নরেন্দ্র ভার্মা। হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, রাজা, তা হলে তোমার অপারেশান সাকসেসফুল!

কাকাবাবু বললেন, আঃ নরেন্দ্র, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না! তুমি খুব নাটক করতে ভালবাসো, তাই না? এমন ভাবে হঠাৎ এসে উদয় হলে, যেন সিনেমার নায়ক। ওই পাথরের আড়ালে কতক্ষণ ধরে ঘাপটি মেরে বসে আছ?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, তা প্রায় ঘণ্টাদেড়েক হবে?

কাকাবাবু বললেন, তার মানে, এতক্ষণ ধরে এখানে যা-যা ঘটেছে, সব তুমি দেখেছ?

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সব, সব। তোমাদের এখানেই তো যতরকম নাটক হল। তবে আগে আমি দেখা দিইনি, কিংবা গুলি চালাইনি, তার কারণ, দেখছিলাম, তোমরা নিজেরা কতটা ম্যানেজ করতে পারো। তোমাদের কৃতিত্বে বাধা দিতে চাইনি।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে এখনই বা গুলি চালালে কেন? অবোধরামকেও আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নিতাম।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, সে কী! তুমি স্টেনগানটা ওকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছিলে। আর একবার হাতে পেলে ও কাউকে ছাড়ত না। ওর বিবেক বলে কোনও বস্তু নেই।

কাকাবাবু বললেন, ওকে ফিরিয়ে দিতে যাওয়া, আর সত্যি সত্যি হাতে তুলে দেওয়ার মধ্যে অনেক তফাত! মাঝখানের কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই অন্য কিছু ঘটে যেতে পারে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, না রাজা, আর আমি ঝুঁকি নিতে চাইনি। তুমি যেই এই ছেলেটাকে বাঁচাবার জন্য ওকে স্টেনগানটা ফেরত দিতে এলে, তখনই ভাবলাম, এই রে, আর তো উপায় নেই, এবার খেলা শেষ করা যাক!

অন্যদের বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। চোখ বড় বড় করে সব শুনছে। জোজোই প্রথম বলল, কাকাবাবু, আপনি জানতেন যে, নরেন্দ্র ভার্মা আমাদের বাঁচাবার জন্য এখানে লুকিয়ে আছেন?

কাকাবাবু বললেন, না, তা জানতাম না। ও তো আগে থেকে কিছু বলে না। তবে আমার একটু-একটু সন্দেহ হয়েছিল। নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি করে কে আমাদের অনুসরণ করবে? কে আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে? আমার তো এই সাতনায় সেরকম বন্ধু কেউ নেই। কামালের কথা বাদ দিচ্ছি, সে গগাপনে অনুসরণ করবে কেন? তা হলে কে হতে পারে?

তারপর নরেন্দ্র ভার্মার দিকে ফিরে বললেন, তুমি এবারেও আমাকে টোপ ফেলেছিলে, তাই না? আমি যে এখানে এসেছি, সে-খবর তুমিই ছড়িয়েছ। খবরের কাগজে আমার কথা ছাপাবার ব্যবস্থা করেছ।

নরেন্দ্র ভামা সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললেন, মাছধরার জন্য যেমন টোপ লাগে, সেইরকম বড়-বড় অপরাধীদের ধরার জন্য তুমি বেশ ভাল টোপ। এই ব্যাটা অবোধরাম জেল ভেঙে পালিয়েছে কয়েক মাস আগে, কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না, তখন ভাবলাম, ও নিশ্চয়ই তোমার ওপর প্রতিশোধ নিতে আসবে। কলকাতায় তোমার বাড়িতে বোমা ছোড়ার ঘটনা শুনে মনে হল, সেটা অবোধরামেরই কীর্তি। রাজা, তুমি যখন সাতনায় বেড়াতে আসতে চাইলে, তখনই ঠিক করলাম, তা হলে অবোধরামকেও এখানে টেনে আনা যাক। তাই তোমার এখানে আসার খবর ছড়িয়ে দিলাম। অবোধরাম তোমাকে মারতে আসবে, আমি পেছন থেকে ওকে এসে ধরব!

কাকাবাবু বললেন, আমিও ভাবলাম, কেউ যখন আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাইছে, তখন বাড়িতে লুকিয়ে বসে থেকে কিংবা পুলিশের সাহায্য নিয়ে বেঁচে থাকা যাবে না। হঠাৎ বোমা ছুড়বে কিংবা চলন্ত গাড়ি থেকে গুলি চালাবে। তার চেয়ে ওদের প্রকাশ্য জায়গায় মুখোমুখি টেনে আনাই ভাল। বাজারে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিলাম যে, মাছ ধরতে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি। সে-খবর পেয়ে ওরা আসবেই। তবে একবার সূর্যপ্রসাদ, একবার অবোধরাম, এরকম যে পরপর আসবে, সেটা চিন্তা করিনি!

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, ওই সূর্যপ্রসাদ তো চুনোপুঁটি। ওর কথা আমিও ভাবিনি। ওকে ফাউ হিসেবে পাওয়া গেছে। অবোধরামই রাঘব বোয়াল।

অংশু বলল, সার, একটা কথা বুঝতে পারছি না। আপনি পুলিশ-টুলিশ না নিয়ে এখানে চলে এলেন। নির্জন জায়গা, ওরা যদি প্রথমেই রাইফেল দিয়ে কিংবা স্টেনগান দিয়ে ট্যারা-রা রা করে গুলি চালিয়ে দিত, আপনি কী করে বাঁচতেন?

কাকাবাবু বললেন, অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে হয়। প্রথমেই গুলি এরা চালায় না। ভাড়াটে খুনিরা দূর থেকে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু যারা দলের সর্দার ধরনের, তাদের প্রত্যেকেরই খুব অহঙ্কার থাকে। তারা সামনে এসে মারার আগে অনেক কথা বলে। নিজের যে কত বুদ্ধি আর শক্তি, সেটা প্রমাণ করতে চায়। এরা যত কথা বলবে, ততই সময় পাওয়া যাবে। যত সময় পাওয়া যায়, ততই ওদের সঙ্গে আরও কথা বলে রাগিয়ে দিতে হয়। রেগে গেলে ওরা অসাবধানী হয়ে পড়ে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, রাজা রায়চৌধুরী খুব লাকি। আগেও অনেকবার দেখেছি, ও কী করে যেন ঠিক বেঁচে যায়।

কাকাবাবু তার পিঠে একটা কিল মেরে বললেন, আমি লাকি, তাই না? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। এর পরের বার তোমাকে টোপ হিসেবে দাঁড় করাব।

অবোধরাম হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিত হয়ে শুয়ে আছে। গুলি লেগেছে তার কনুইতে, রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। আহত অবস্থাতেও সে চেয়ে আছে কটমটিয়ে।

সন্তু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার মুখের দিকে। এবার বলল, কিন্তু কাকাবাবুর অসুখের সময় আমাদের বাড়িতে কালো চশমা পরে কে এসেছিল? সে তো এই লোকটা হতে পারে না! অবোধরাম বাঙালি নয়, কিন্তু সে পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেছিল। তা ছাড়া, খুব সম্ভবত তার একটা চোখ পাথরের।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, না, সে এ নয়। তার নাম কানা হাবলু। পোশাকি নাম হাবুল সিং। সে বাঙালি হলেও অমৃতসর শহরের লোক। কখনও বাঙালি সাজে, কখনও পাঞ্জাবি। মাথায় বুদ্ধি বিশেষ নেই, কিন্তু গায়ে খুব জোর। একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতির কেসে ধরা পড়ে দিল্লির এক জেলে অবোধরামের সঙ্গে ছিল। অবোধরামের বুদ্ধিতেই সেও জেল থেকে একসঙ্গে পালায়। অবোধরাম তাকেই কলকাতায় পাঠিয়েছিল তোমার গতিবিধি জানবার জন্য। গ্যাস বোমা বোধ হয় নিজের বুদ্ধিতেই সে ছুড়েছিল। ঠিক বলেছ সন্তু, কানা হাবলুর একটা চোখ পাথরের।

কামাল বললেন, আমাকেও বোধ হয় সেই লোকটাই একবার আক্রমণ করতে এসেছিল।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, হতেই পারে। তবে সে কয়েকদিন আগে ধরা পড়ে গেছে, তাকে জেরা করে সব জানা যাবে!

কাকাবাবু বললেন, একটা মজা কী জানো, সন্তু আর জোজো আমাদের আফগানিস্তানের সেই প্রথম অভিযানের কাহিনীটা খুব শুনতে চেয়েছিল, কদিন ধরে কামাল আর আমি সেটা ওদের বলছিলাম। ওই সময়ই অবোধরাম এসে হানা দিল!

নরেন্দ্র ভার্মা অবোধরামের দিকে তাকিয়ে বললেন, পেহলবান, এই স্টেনগানটা জোগাড় করলে কোথা থেকে? তোমার টাকার অভাব নেই, চুপচাপ কোনও গ্রামে গিয়ে লুকিয়ে থাকলে তোমাকে খুঁজে বার করা যেত না। রাজা রায়চৌধুরীকে খোঁচাতে এসেই তুমি ধরা পড়লে।

অবোধরাম গম্ভীর গলায় বলল, কোনও জেল আমায় ধরে রাখতে পারবে না। আমি আবার বেরোব। তোমাদের ওপর ঠিক প্রতিশোধ নেব।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? যদি সত্যিই আবার বেরিয়ে আসতে পারো, তা হলে সেবারে নরেন্দ্রকে টোপ রাখব!

কামাল বললেন, ওর ডান হাতের পাঞ্জাটা একেবারে ভেঙে দিলে কেমন হয়? তা হলে আর কোনওদিন ও আর বন্দুক পিস্তল ধরতে পারবে না।

কাকাবাবু বললেন, না, না, ওসব করতে যেয়ো না! আমরা তো বিচারক নই, আদালত ওকে যা শাস্তি দেবে, সেটাই ও ভোগ করবে।

কামাল বললেন, ও দু-দুবার আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিল, আমার ইচ্ছে করছে।

নরেন্দ্র ভার্মা তাঁর কাধে হাত দিয়ে বললেন, মাথা ঠাণ্ডা করুন কামালসাহেব! দেখছেন না, রাজা কেমন ফুর্তিতে আছে। চলো রাজা, এবার যাওয়া যাক। আর এখানে থেকে কী হবে?

কাকাবাবু বললেন, তোমরা এই লোকগুলোকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। আমি এখন যাচ্ছি না। মাছ ধরতে এসেছি, এইবার মন দিয়ে মাছ ধরতে হবে।

কাকাবাবু জলের ধারে এগিয়ে গিয়ে ছিপ নিয়ে বসলেন। গুনগুন করে গান ধরলেন, আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি/ সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা/আমায় চেন কি?